শ্রীগুরু-প্রসঙ্গ।

শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের
সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত ও উপদেশাবলী



শ্রীশিবচরণ চক্রবর্ত্তী উকিল
প্রণীত।

১ম সংস্করণ।

শ্রীগৌরানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
সীতাকুণ্ড—ভোলানন্দ আশ্রম, চট্টগ্রাম

১৩৩৬ সন।

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীহৃদয়লাল চক্রবর্ত্তী।
হেনা প্রেস, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

নিবেদন।

অসংখ্য তপন-তলে খদ্যোতের কণা,
তা'হতেও ক্ষীণপ্রভ মম জ্ঞান-দীপ,—
পতঙ্গ-নিশ্বাসে হায় সতত চঞ্চল,—
কেমনে ভাতিবে উহা বিশ্ব-জ্যোতির্ম্ময়ে!

স্বামীজী মহারাজের জীবন কথা ইতিমধ্যে পুস্তকাকারে ২।১খানা বাহির হইয়াছে, কেহ কেহ লিখিতেছেন, অনেকেই লিখিবেন। সাধু, সুধী, ভক্ত, ঠাকুরের একান্ত অন্তরঙ্গ প্রিয় শিষ্যগণই একার্য্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মৎ-সদৃশ বহির্মুখী ব্যক্তির পক্ষে ইহা শোভা পায় না। শ্রীরামচন্দ্রের সাগর সেতু নির্ম্মাণ কার্য্যে কাঠবিড়ালীর যেমন সাহায্য করিবার সাধ জন্মিয়াছিল, এই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত মহাপুরুষের জীবনলীলা প্রচারে সাধন ভজন বিহীন স্বল্পমতি মাদৃশ ব্যক্তির বাসনাও তদ্রূপ। ভরসা—মহাপুরুষগণের জীবন-চিত্র অঙ্কনে কবির সরস কবিত্ব কল্পনা, বৈজ্ঞানিকের গভীর গবেষণা কিংবা শিল্পীর অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের প্রয়োজন করে না; স্বভাব-সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্মফুলটী যেমন সরোবরের শোভা, অলঙ্কার-বিহীন সারসত্য গুলিও তদ্রূপ মহাপুরুষ জীবনের বিশেষত্ব। তাই নিতান্ত অকৃতী হইয়াও সেই সত্যগুলি মাত্র প্রদর্শনে প্রয়াস পাইয়াছি।

হে সহৃদয় পাঠক, পাঠিকাগণ! একার্য্যে যে সব ভুল প্রমাদ ত্রুটী পরিলক্ষিত হইবে তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন, পরন্তু সানুগ্রহে তাহা প্রদর্শন করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব। ইতি

লামচর, নোয়াখালী
১৩৩৬ সন পৌষ সংক্রান্তি,
কুম্ভ-যোগ।

দীনাতিদীন
শ্রীশিবচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ঠাকুর, তোমারই মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিয়া তোমার লীলা প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ক্ষুদ্র শফরী আমি, তোমার মহিমার অনন্ত জলধি-বিচরণ অসম্ভব হইলেও কোণৈক প্রদেশে সঞ্চরণের ক্ষীণ আশা ধরিয়া যাত্রা করিলাম। ঠাকুর! দয়া করিয়া তোমার পদাশ্রিত এই ক্ষুদ্র জীবকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দাও—এই প্রার্থনা।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥

শ্রীচরণাশ্রিত
শ্রীশিব।

সূচী-পত্র।

উপক্রমণিকা।

১ম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

২য় পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা।

গুরু-করণ-প্রথা।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে ধর্ম্মের অবনতির একটী কারণ গুরু-করণ প্রথার অপলাপ ও অপব্যবহার। হিন্দু সমাজের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহাদের অধিকাংশই গুরুকরণ প্রথার বিরোধী। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব আমাদের মধ্যে এত বেশী প্রবেশ করিয়াছে যে, স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় একটা অদ্ভুত ভাব আমাদের পশ্চাৎগামী হয়। যে সকল যুক্তি তর্ক বা ভাব ঐ ইংরেজী পুস্তকে স্থান পায় নাই কিংবা তাহার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না, এমন কোন বিষয়ে আমরা শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। ইংরেজী পুস্তক বা তন্নিহিত মতামত যেন ঠিক একটা নিখুত মাপকাঠি। ইহাদের নিকট হিন্দু-শাস্ত্রগত আচার ব্যবহারের মূল্য কতদূর? না,—যতদূত ঐ সাহেবী কেতাবের সহিত ঐক্য হইবে। এজন্য রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীগুলি আমাদের নিকট আরব্যোপন্যাসের ন্যায় অনুমিত হইয়া থাকে। রাবণের পুষ্পকরথে সীতা সহ পঞ্চবটী হইতে শূন্যপথে লঙ্কায় গমন একটা গুলিখোরের গল্প বলিয়াই এত দিন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এরোপ্লেনের আবিষ্কার হওয়া অবধি ঐ সকল অবিশ্বাসীদের মাথা চুলকানি আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির নিকট হিন্দুর তন্ত্র আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনা সদৃশ নগণ্য ছিল, কিন্তু যে-ই উড্রফ সাহেবের তন্ত্রের টীকা বাহির হইল অমনি তাঁহারা ফুসাফুসি আরম্ভ করিলেন, "হাঁ, তাই নাকি? তন্ত্রের মধ্যে এতই আছে? আচ্ছা, তবে দেখা যাউক তন্ত্রটা কি বলে"

ইত্যাদি। একেই বলে হাতের শাখা দর্পণে দেখা। যাহা আমাদের নিজস্ব পৈত্রিক সম্পত্তি, যাহার বাতাসে আমরা মানুষ হইতেছি, জীবন ধারণ করিতেছি, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বিলাত হইতে প্রমাণ যুক্তি আমদানী করিতে হয়। গুরুকরণ প্রথার অনাবশ্যকতা সাধারণতঃ এই শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতেই উক্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে 'ঈশ্বর' ও 'মানুষ' এর মধ্যে সম্বন্ধ পাতাইতে হইলে 'গুরু' নামধারী অন্য মনুষ্যের ঘটকালীর প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর ও মানুষ,—উপাস্য ও উপাসক এর মধ্যে চুল পরিমাণও ব্যবধান থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ভগবানকে পাইতে হইলে গুরুরূপা মধ্যস্থের কোন প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম রাজ্যে এই ঘটকালী বা মধ্যস্থতাবাদের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থিত হয় তাহা আপাততঃ বড়ই শ্রুতিমধুর বলিয়া মনে হয়। উপাসক উপাস্যকে ডাকিবে, ইহাই সরল নীতি; কিন্তু মধ্যস্থলে উপাস্যের তুল্য-স্থানীয় করিয়া গুরু রূপী মানুষকে দাঁড় করাইয়া ভগবদুপাসনার একটা জটিলতা সৃষ্টি করার প্রয়োজন কি? এই যুক্তি অগভীর চিন্তাশীলের পক্ষে বেশ মনোহারিণীই বটে, কিন্তু ইহার ভিতরে যে একটা গূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা একটু অনুধাবনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা।

প্রথমতঃ, ধর্ম্মরাজ্যে গুরুর প্রয়োজন আছে কিনা দেখা যাউক। চিন্তা করিলে দেখিতে পাই গুরুর প্রয়োজন প্রত্যহ প্রতি পদবিক্ষেপে। গুরুভিন্ন এক মুহূর্ত্তও কেহ চলিতে পারে না। শিশু জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র 'মাতাগুরু' অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহাকে শিখাইয়া দিলেন, "হে শিশো,

তোমার জীবন ধারণোপযোগী ক্ষীরধারা এই আমার বুকে রহিয়াছে, তুমি তাহা পান করিয়া জীবিত রহ।" মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া জীব এই সর্ব্বপ্রথম মাতা গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তৎপর ক্রমে যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ততই পিতামাতা আত্মীয় বন্ধুরূপী গুরু হইতে ভাষা কথন, আহার্য্য গ্রহণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য শিখিতে লাগিল, অভিজ্ঞতার মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাঠশালার গুরু আসিয়া আরও কিছু শিখাইল। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন বশতঃ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে বৈদ্য-গুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি কতক গুলি বিধি-নিষেধ পালনের আদেশ দিয়া গেলেন। যে পালন করিল সে সুস্থ হইল, যে অবহেলা করিল সে রোগ যন্ত্রণা ভুগিতে লাগিল। স্কুল কলেজে যিনি গুরু হইলেন তিনি নানারূপ আদেশ উপদেশ কঠোরতা ও ত্যাগের ভিতর দিয়া শিষ্যকে চালাইতে লাগিলেন; যে আজ্ঞাবহ শিষ্য গুরুর আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিল সে সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া সুখ-সৌভাগ্য ও গৌরবে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন, এই সকল নিত্য দৃষ্ট সাধারণ সত্য অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য নাই। সংক্ষেপে, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া পরিচালনে এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য গুরুর আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মনুষ্য জীবন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন ভাগে বিভক্ত। শারীরিক উৎকর্ষতা লাভ করিতে হইলে শরীর বিদ্যাবিশারদের আশ্রয় লইতেই হইবে; স্যাণ্ডো, শ্যামাকান্ত ও রামমূর্ত্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া কত যুবক বুকে পাথর ভাঙ্গিতেছে, হাতি উঠাইতেছে, শিকল ছিঁড়িতেছে, মটর টানিয়া রাখিতেছে ইত্যাদি। স্বয়ং রাজাধিরাজ রোগ যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে করিতে বৈদ্যরূপী সাধারণ মনুষ্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেছে। নিতান্ত ক্রীতদাসের মত তাঁহার আজ্ঞাবহ

হইয়া রোগ যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে। আবার মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভার্থ ঐ ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকেই গুরুত্বে বরণ করিতেছে। দেহ বলে, কুল গৌরবে ও পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও জ্ঞান লাভার্থ ক্ষীণাঙ্গ ও নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। এভাবে দেখা যায় মানুষের শরীর ও মনের উন্নতি বিধানার্থ গুরুর আবশ্যকতা একান্ত অনিবার্য্য। অন্ততঃ এই দুই বিষয়ে গুরুশক্তি আঁধার নিশায় আলেয়ার মত ক্ষীণদৃষ্টি মানুষকে প্রকৃত শান্তি ও সুখের পথে পরিচালনা করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করিতেছি। শরীর হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ ; একের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতে অন্যের নিকৃষ্টতা বুঝাইতেছে না ; মানসিক শক্তি বিকাশের চেষ্টা শারীরিক শক্তি বিকাশের চেষ্টা অপেক্ষা অধিক গুরুতর এবং আত্মোন্নতির কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জটীল ও রহস্যপূর্ণ ইহাই বুঝাইতেছে। যদি অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্যগুলির জন্য গুরুর প্রয়োজনীতা স্বীকার করিতে হয় তবে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও জটীল তাহার জন্য গুরুর বা চালকের আবশ্যকতা নাই, ইহা প্রলাপ বাক্য মাত্র। যাঁহারা বলেন ভগবান্ উপাস্য—জীব উপাসক, ইহার মধ্যে কোন ব্যবধান বা মধ্যস্থতা থাকিতে পারে না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে 'মানুষ উপাসক—স্বাস্থ্য সুখ উপাস্য', 'মানুষ উপাসক—বিদ্যা, জ্ঞান উপাস্য', মানুষ ত নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারাই অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া আরোগ্যলাভ করিতে পারে। রোগ উপস্থিত হইলে নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া তৎপ্রতিকারের ঔষধ বা উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে। এই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা লাভ করিতে মানুষ অন্যের সাহায্য লয় কেন ? জ্ঞানরূপ অমৃত ফল ডালে পাকিয়া লক্ লক্ করিতেছে, স্বহস্তে পাড়িয়া রসনা

পরিতৃপ্ত করিলেইত হয়। তর্কের খাতিরে এখানে বলিতে হইবে যিনি অন্য গুরু না মানিবেন, তিনি রোগ হইতে অপর চিকিৎসকের কৃত ব্যবস্থা বা ঔষধও গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং জ্ঞানার্জ্জনেও অন্য লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারিবেন না। কারণ তাহা হইলেই উক্ত চিকিৎসক বা লেখককে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা কখনও ঘটিয়া উঠে না; অন্যের উপদেশ ব্যতীত একমুহূর্ত্তও কেহ চলিতে পারে না। এই উপদেশ কেহ লিখিত ভাষায়, কেহবা মৌখিক ভাষায় পাইতেছেন। আর এক কথা, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "কেন, ধর্ম্ম গ্রন্থাদি হইতে উপদেশ নিয়া কাজ করিলেইত হইল, অন্য একজন আসিয়া বহির কথা মুখে বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, 'সীবন শিক্ষা' পাঠ করিয়া সেলাই, 'পাকপ্রণালী' পাঠ করিয়া রন্ধন এবং চরক-সংহিতা পাঠ করিয়া চিকিৎসা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা যেমন হাস্যাস্পদের বিষয়, গুরু ভিন্ন শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি করাও তদ্রূপ। সামান্য একটু অপরিচিত পথ ভ্রমণে যাহারা দিশেহারা হইয়া "কে কোথায় আছ গো, আমাকে পথ চিনাইয়া দাও গো" বলিয়া কান্দিয়া আকুল হয় তাহার কিনা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম আধ্যাত্মিক উন্নতি সমাধানে দীর্ঘ—অতিদীর্ঘ কঠোর কণ্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথ—"ক্ষুরস্যধারা-নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমস্তৎ কবয়ো বদন্তি" পণ্ডিতগণ যাহাকে ক্ষুরের শানিত ধার তুল্য দুরতিক্রমণীয় বলিয়াছেন—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের এহেন দুর্গমপথ একাকী অতিক্রম করিবার জন্য পৌরুষ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে? ইহা অপেক্ষা পাগলের প্রলাপ আর কি হইতে পারে? যদি শাস্ত্রের কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেন তবে শাস্ত্র কি বলে শুনুন :—

যথা জাত্যন্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্প-কোটিভিস্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে। তস্মাৎ সদ্‌গুরু কটাক্ষলেশবিশেষেণা-চিরাদেব ভবতি। (ত্রিপাদ্বিভূতি মহা নারায়ণোপনিষৎ)।

যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তির কখনই রূপজ্ঞান হয় না, তদ্রূপ গুরূপদেশ ভিন্ন কোটি কল্পেও তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না ; পরন্তু সদ্‌গুরুর কটাক্ষলেশ দ্বারা অচিরেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

শ্রীগুরুকৃপায়া শিষ্যস্তরেৎ সংসার বারিধিম্।
বিনাচার্য্য ন হি জ্ঞানং ন মুক্তির্নাপি সদ্গতিঃ॥

(শান্তিগীতা)

একমাত্র গুরুর কৃপা বশতঃই শিষ্য সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, গুরু ভিন্ন জ্ঞান লাভ, মুক্তি বা সদ্‌গতি কখনই হইতে পারে না। হে নব্য শিক্ষিত বাবু মহাশয়, উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য শ্রবণে শ্লেষাত্মক অট্টহাস্য করিবেন না। বিজ্ঞান জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বস্তু বিশেষের ধর্ম্ম বা ক্রিয়াশক্তি সম্বন্ধে রাসায়ন পরীক্ষাগারে যাহা স্থির করেন, আপনারা নির্ব্বিচারে তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভারত-ভূমি ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য আজিও জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই ভারতের পূজ্য শ্রেষ্ঠ মুনিঋষি মহাপুরুষগণ যুগযুগান্তর ধরিয়া নিজ নিজ সাধন ও তপস্যার পরীক্ষাগারে বহু গবেষণান্তে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করিবেন না। আপনার স্বকপোল কল্পিত বা পাশ্চাত্যশিক্ষা-সুলভ দু'চারিটী যুক্তি তর্কের ফুৎকারে এই বিরাট হিন্দু শাস্ত্রটাকে একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন না। মনে রাখিবেন, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা জটীলতম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, ইহা সাধনার প্রেকৃটিকেল ক্লাশে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত। সৌভাগ্য ক্রমে ইহাতে একটু প্রবেশ করিতে পারিলেই বুঝিতে পারিবেন

পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষীণালোকে হিন্দুশাস্ত্রটাকে দর্শন করা আর জোনাকির বাতিতে সূর্য্য অন্বেষণ করা একই কথা। তবে দুঃখের বিষয়, শাস্ত্রাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ আজ কাল-প্রভাবে হীন স্বার্থপরতায় ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। শুধু তাঁহাদের কার্য্য ও শাস্ত্রব্যাখ্যার দোষে হিন্দু-ধর্ম্মনীতির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইবেন না। প্রকৃত জিজ্ঞাসু হইয়া সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিলেই হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন; নতুবা নহে।

গুরুর-আদর্শ।

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল তদ্দ্বারা গুরুর আবশ্যকতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে সরল সত্য বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন বিচার করিতে তাহার মূল সত্য নিয়া আলোচনা করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। সব বিষয়েরই ভাল মন্দ, উত্থান পতন আছে। বস্তু বিচার করিতে সেই জাতীয় উৎকৃষ্ট একটীকে নিয়াই বিচার করিতে হয়। পচা দুর্গন্ধময় ফলটী পরীক্ষা করিলে তাহার গুণাগুণ বুঝা যায় না। আধুনিক হিন্দু সমাজে এই গুরুকরণ প্রথা যেরূপ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কখনও আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে না। আমি ক্রমে এই হীনাবস্থার চিত্রাঙ্কন করিতে চেষ্টা করিব; কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রানুযায়ী গুরুকরণ প্রথার প্রতিই লক্ষ্য রাখিবেন; ইহাই বাঞ্ছনীয়।

বাস্তবিক বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কুলগুরু অর্থাৎ পৈত্রিক গুরুগণের যেরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে তাঁহাদের এমন কোন শক্তিই নাই। আধুনিক সমাজে "শিষ্য-করণ" প্রথা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কবির বলিয়াছিলেন, "গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা নাহি মিলে এক।"

তুমি, আমি, রাম, শ্যাম সকলেই গুরু সাজিয়া শিষ্য করিতে চাই কিন্তু একজনও চেলা হইতে চাহি না। গুরুর আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া দেখাইয়াছি যে, জীবনের প্রতি কার্য্যে গুরুর আবশ্যক। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এক পদও গুরু ভিন্ন নিরাপদে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু এই জটীলতম বিষয়ে আজকাল অজ্ঞান গুরুর সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন যখন অন্য বর্ণের গুরু হইবার অধিকার নাই তখন ব্রাহ্মণগণই এই জন্য সর্ব্বাংশে দায়ী ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত সমাজ হিতাকাঙ্ক্ষী, শিষ্য-কল্যাণার্থী, সৎকর্ম্ম-পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণও যে না আছেন তাহা নহে। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজন-পূজ্য ও নমস্য। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, আমার পশ্চাল্লিখিত আপত্তি সমূহ ইঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।

মানসিক শিক্ষা কার্য্যে আমরা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর গুরু দেখিতে পাই:—(১) পাঠশালার গুরু (২) স্কুল বা বিদ্যালয়ের গুরু; (৩) কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু। এক গুরুর শিক্ষা কার্য্য শেষ হইলে ছাত্রগণ অন্য গুরুর আশ্রয় লইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক সমাজে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কেবল মাত্র পাঠশালার গুরুই পরিলক্ষিত হইতেছে। স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু ক্বচিৎ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ "গুরুত্যাগ" রূপ এক ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজকে আরও অধঃপাতিত করিতেছেন। এই হেতু নিম্নে অতি সংক্ষেপে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়ে লিখিত আছে—

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়মুত্তমং।
শাব্দে পারেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়েৎ॥

একান্ত মঙ্গল জানিতে অভিলাষী জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দ ব্রহ্মের পরগামী ও পরব্রহ্মে নিমগ্ন উপশমাবলম্বী এমন ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইবে।

তথাচ গীতা—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

পরব্রহ্মকে যিনি তত্ত্বতঃ দর্শন করিয়াছেন সেই জ্ঞানীকেই প্রণিপাতাদি সহ প্রশ্ন করিলে তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন।

তথাচ শ্রুতিঃ মুণ্ডকোপনিষৎ

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদ পারদর্শীকে গুরু করিয়া সমিধ্-হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে।

জ্ঞানত্রয়ং যত্রাভাতি স গুরুঃ শিব এবহি।
কামাখ্যা তন্ত্র।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥
ইতি তন্ত্র।

শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্থকো যস্ত স গুরুঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
সিদ্ধোঽসাবিতি চেৎ খ্যাতঃ বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্গুরু কথিতঃ প্রিয়ে ॥
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং ব্যক্তি সাধু মনোহরং।
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং ব্যক্তি য এব সদ্গুরুশ্চ সঃ ॥

সদা যঃ শিষ্য বোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্‌গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ॥
পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গুরু পদাম্বুজে ভক্তির্য্যস্যৈব সদ্‌গুরুঃ স্মৃতঃ॥
ইত্যাদি গুণ সম্পত্তিং দৃষ্ট্বা দেবী গুরুং ব্রজেৎ,
ত্যক্ত্যাক্ষমং গুরুং শিষ্যো নাত্রকাল বিচারণা॥

কামাখ্যা তন্ত্র।

উল্লিখিত উদ্ধৃত শ্লোকাবলি হইতে দেখা যাইতেছে যে তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদপারদর্শী, যিনি জ্ঞানত্রয় (আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব) লাভ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানাঞ্জন দ্বারা অজ্ঞানীর চক্ষুরুন্মিলন করিতে সমর্থ, শান্ত, দান্ত, কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, পরমার্থ বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি সম্পন্ন ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু স্থানীয় এবং শিষ্যের আধ্যাত্মিক মঙ্গল বিধানে সমর্থ। কিন্তু বলিতে বড়ই দুঃখ হয় বর্ত্তমান কুলগুরুগণ, যাঁহারা শিষ্যরূপ যাত্রীগণকে ভবসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ করিবার জন্য কর্ণধার সাজিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই দাঁড়-বৈঠাতরী-সম্বল বিহীন সাথোয়া সাজিয়া যাত্রী সহ তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন কিন্তু তীর্থের পথ চিনেন না। শিষ্য গুরুভার শিলা খণ্ড গলায় বাঁধিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন, ডুবিবার উপক্রম দেখিয়া ত্রাহি মাং গুরো, ত্রাহি মাং গুরু' বলিয়া কাতর ধ্বনি করিলেন, তরণি সম্বল বিহীন কোন দুর্ব্বল ব্যক্তি ততোধিক গুরুভার শিলাখণ্ড পৃষ্ঠে বাঁধিয়া 'গুরু' বেশে শিষ্যকে উদ্ধার করিতে ঝাঁপ দিলেন। উদ্ধার করা দূরে থাকুক কার্য্যতঃ উভয়ে ডুবিয়া মরিতেছেন।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

কঠোপনিষৎ।

যাহারা অজ্ঞতায় অবস্থিত অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা দন্দ্রম্যমান অর্থাৎ অতিশয় কুটিল ভাবে নানা পথে চালিত হইয়া অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধ দিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।

এইত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা!

"অন্ধ বলে ভায়া তাম্‌সা দেখ্‌বে চল।"

ইহাদের নিকট দীক্ষা কার্য্য হাট বাজারের একটা মুদি তেজারতি ব্যবসায় সদৃশ, তাই লজ্জার মাথা খাইয়া অনেকে নামের পশ্চাতে "ব্যবসায় গুরুতা" লিখিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকেন।

গৃহীর গুরু সন্ন্যাসী হইতে পারে কি না?

যদি কেহ এইরূপ ব্যবসায়ী অন্ধরূপী কুল গুরুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া কোন জ্ঞানী মুক্ত পুরুষের আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করে তবে ইহারা এক সুবর্ণনীতির অবতারণা করিয়া থাকেন। ইহারা বলেন,—'গৃহস্থের গুরু গৃহীই হইবে, গৃহীর গুরু সন্ন্যাসী হইতে পারে না' এই যুক্তি কতদূর সমীচীন তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য দ্বিতীয় এবং সন্ন্যাস চতুর্থ। গৃহীগণ সাধারণতঃ সংসারাবদ্ধ বিষয়-তাপ ক্লিষ্ট। (জনকের মত গৃহীর কথা বলিয়া সময় নষ্ট করা বৃথা, কারণ তদ্রূপ দ্বিতীয় জনক এখনও দেখা যায় নাই) উহারা অর্থ বিত্ত পুত্র-গৃহদারাদির মোহমায়ায় ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত তৃণটীর মত ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান হইয়া প্রকৃত মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। কাম ক্রোধ লোভ মিথ্যা প্রতারণার তীব্র বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া শান্তির সুশীতল

মরুৎ হিল্লোলের প্রত্যাশায় ইহারা ছুটিয়া গিয়া গুরুরূপা মহামহীরুহের পদাশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু সেখানেও যদি ছদ্মবেশী বিষয় বাসুকি সর্ব্বদা বিষোদ্গার করিয়া ইহাদিগকে দংশন করিতে থাকে তবে ইহাদের উপায় কি? সন্ন্যাসী বলিতে অনেকের একটা ভ্রান্তধারণা এই যে, ইহারা অর্থ, বিত্ত, স্ত্রী, পুত্র সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা কাহাকে বলে জানেন না; সমাজ চিত্র, লোক চরিত্র কিম্বা রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; ইহারা কেবল বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া কঠোর জীবন যাপন করতঃ সাধের মানব জীবনের সমস্ত সুখ সম্পদ বিসর্জ্জন করিতেছেন মাত্র। বাস্তবিক ইহা সম্পূর্ণ ভুল। 'সন্ন্যাস' চতুর্থাশ্রম বা জীবন বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী। এম, এ ক্লাশে উঠিতে হইলে যেমন তন্নিম্ন সমুদয় শ্রেণীর পাঠ সমাপন করতঃ তৎতৎ বিভাগীয় সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যাইতে হয়, তদ্রূপ সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে পূর্ব্ব তিন আশ্রম অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। সুতরাং গার্হস্থ্যাদি সকল আশ্রমের অভিজ্ঞতা হেতু সাংসারিক ব্যক্তিগণকে সর্ব্বপ্রকার হিতোপদেশ দানে এবং প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির পথ প্রদর্শন করিতে একমাত্র তাঁহারাই সমর্থ। যদিও শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে উক্ত নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কিন্তু ইহাই প্রকৃত বৈদিক পন্থা।

আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষা বলি পরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥ মনুঃ ৬।৩৪।

অর্থাৎ আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন পূর্ব্বক তৎতৎ আশ্রমোচিত সমুদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিয়া তবে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী (পেট বৈরাগীর কথা নহে) ধন্বন্তরীর ন্যায় তাঁহারাই সর্ব্বরোগ বিনাশক ঔষধ দানে সমর্থ।

অনেকে তন্ত্রের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন 'গৃহীর গুরু সন্ন্যাসী হইতে পারে না। তন্ত্রের যে সকল শ্লোক দ্বারা বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁহাদের মতের সমর্থন করিয়া থাকেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। যতের্দীক্ষা পিতুর্দ্দীক্ষা দীক্ষাচ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিনো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥
গণেশ বিমর্ষিণী)

২। সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্তাচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।
(কুলার্ণবতন্ত্র)

৩। কলত্র পুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালু সর্ব্বসম্মত।
দৈবে পিত্রেহগ্নি মিত্রেচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥
(কলাপতন্ত্র)

প্রথম শ্লোকে উক্ত হইল, যতী বা সন্ন্যাসীর দীক্ষা (অন্যান্য বিষয় এ স্থলে বিচার্য্য নহে) কল্যাণজনক নহে। যিনি জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বত্যাগী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহার দীক্ষা কল্যাণদায়িকা হইবে না এ কেমন কথা? বাস্তবিক তন্ত্রের গূঢ়ার্থের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা নিতান্ত সহজ নহে। এস্থলে 'কল্যাণ' অর্থে গৃহস্থের ঐহিক কল্যাণ বুঝা যাইতেছে, যেহেতু যতী বা সন্ন্যাসীর দীক্ষা সাংসারিক ব্যক্তিগণের ঐহিক বিষয়ে প্রায়ই মঙ্গল জনক হয় না। কারণ সর্ব্বদা ঐ সকল মুক্ত ত্যাগী পুরুষের সঙ্গ ও হিতোপদেশে গৃহী ধন-রত্ন-পুত্র-কলত্রাদি ঐহিক সুখসম্পদের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রতি যেরূপ উদাসীন হইয়া পড়েন তাহাতে তদ্দারা আর সাংসারিক উন্নতি হইতে পারে না। এই সময় ক্রমশঃ বৈরাগ্য আসিয়া ভোগ্য বিষয় সমূহকে তাহার নিকট বিষময় করিয়া তোলে।

ভোগ্যং বৈ ভোগিভোগং বিষময় বিষয়ং
প্রোষিণী চাপি পত্নী।
বিত্তং চিত্তপ্রমাদং নিধন-কর ধনং
শত্রুবৎ পুত্রকন্যে॥ (শান্তিগীতা)

(বৈরাগ্য উদয় হইলে) ভোগ্য বিষয় ও তাহার সম্ভোগ বিষতুল্য জ্ঞান হয়। পত্নী—তাপ দায়িনী, বিত্ত—চিত্ত পীড়ক, ধন—নিধনকারী ও পুত্রকন্যা—শত্রুবৎ মনে হয়। এই অবস্থায় সে প্রেয়—সংসার সুখ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ—আত্মিক-মঙ্গলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু সংসারিক অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐহিক মঙ্গলই পরম কল্যাণ।

"শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়োমন্দো যোগক্ষেমা বৃণীতে"। (কঠোপনিষৎ) জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়ঃকেই গ্রহণ করেন, আর মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি প্রেয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মিক কল্যাণ ও ঐহিক কল্যাণ পরস্পর বিরুদ্ধ। একের হ্রাস বৃদ্ধির পর্য্যায় ক্রমে অপরের বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটিয়া থাকে। তাই ভগবান বলিয়াছেন, 'যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ'; 'সর্ব্বনাশ' অর্থে 'সংসার নাশ'। প্রকৃত সন্ন্যাসী বা সাধুর আশ্রয় লইলে বদ্ধ গৃহীর এই সর্ব্বনাশ বা সংসার নাশ ঘটিয়া থাকে। নশ্বর ঐহিক উন্নতিই যাহাদের লক্ষ্য তাহাদের প্রতিই ঐ শ্লোক লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরমার্থীর পক্ষে ইহা কখনও প্রযোজ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের অর্থ অতি সহজেই বুঝা যাইতেছে। গৃহী ব্যক্তির মধ্যে কেহই গুরু হইতে পারিবে না,—এমন কোন বাধা নাই; কিন্তু যে গৃহী উক্ত গুণ সম্পন্ন অর্থাৎ শাস্ত্রবেত্তা, পুত্রবান্, সর্ব্বসম্মত, অরিমিত্রে দয়ালু ইত্যাদি,—তদ্রূপ গৃহীই একমাত্র গুরু হইবার উপযুক্ত, অন্য গৃহী নহে, ইহাই উক্ত শ্লোক দ্বয়ের স্থূল মর্ম্ম। এই ক্ষণ যতী বা সন্ন্যাসী গুরু সম্বন্ধে তন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে কি বলিতেছেন দেখুন :—

১। তীর্থাচার যুতো মন্ত্রী জ্ঞানবান্ সুসমাহিতঃ।
নিত্যানিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ স্যাদ্ভৌতিকোঽপি চ॥

(শক্তি যামল)

২। যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণং ॥

(সিদ্ধ যামল)

তীর্থাচার যুক্ত, মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন, জ্ঞানবান, সমাহিত চিত্ত, নিষ্ঠাবান যে যতী বা সন্ন্যাসী তিনিই গুরু বলিয়া খ্যাত। যদি সৌভাগ্য ক্রমে কখনও এরূপ গুরু-সাক্ষাৎ হয় তবে গুরু বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহা হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। যদি ৸৴০ পৃষ্ঠার লিখিত শ্লোকদ্বয় নিষেধাত্মক হয় তবে ৸৵০, ৸৶০ পৃষ্ঠায় লিখিত শ্লোকদ্বয়ের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? যাঁহারা তন্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন তাঁহাদের উপরই এই সামঞ্জস্যের ভার ন্যস্ত করিলাম।

আমরা এইক্ষণ যুক্তি তর্কের মারামারি ছাড়িয়া "মহাজন যেন গতঃ সঃ পন্থা" এই নীতির দিব্যালোকে পৌরাণিক ও আধুনিক যুগে মহাজন-অনুসৃত কোন পথ দেখিতে পাই কিনা, দেখা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বকালে (গৃহস্থ) রাজা মহারাজগণের গুরু প্রায়ই বনবাসী সন্ন্যাসীগণ হইতেন। মহারাজ উত্তানপাদ-তনয় ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব দেবর্ষি নারদ হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শুকদেবাচার্য্য মিথিলাধিপতি জনকের গুরু ছিলেন ব্যাসদেব। কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় দ্বারকাধিপতি স্বয়ং কৃষ্ণ মহারাজ দুর্ব্বাসা ঋষিকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যার অধিপতি দশরথের কুলগুরু বশিষ্ঠ ছিলেন, লঙ্কেশ্বর রাবণের গুরু সনৎকুমার ঋষি বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এইক্ষণ কলিযুগে অবতরণ করা যাউক। রুদ্রাবতার শঙ্করাচার্য্যের কত রাজামহারাজা শিষ্য ছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব জগতের সর্ব্বাবতারসার শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থাশ্রমে থাকাবস্থায় সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী হইতে দীক্ষা নিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত অদ্বৈত আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য ইহারা গৃহী হইয়াও (ক্রমে) সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী, লোকনাথ গোস্বামী ও গোপাল ভট্ট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এসব বৈষ্ণবের কথা বলিয়া যদি কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করেন তবে দেশ ও কাল হিসাবে নিকট ঐ যে মাতঙ্গমুনির আশ্রম মেহারাখ্য প্রদেশ, তথাকার সেই মহালিঙ্গোপরি শবাসনারূঢ় যোগস্তিমিতনেত্র শাক্ত-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর—যাঁহার বংশধরগণ আজিও ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য বলিয়া সর্ব্বত্র সম্পূজিত—একবার তাঁহার কথা স্মরণ করা যাউক। সেই সে তাল-তরু-তলে পুত্র-কলত্র সমাবিষ্ট মহাগৃহী সর্ব্বানন্দ এক অজ্ঞাত-কুল-শীল সন্ন্যাসী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। যখন সন্ন্যাসী ঠাকুর সর্ব্বানন্দকে দীক্ষা লওয়ার জন্য বলিলেন বিরুদ্ধবাদিগণের মতে বোধ হয় তখন সর্ব্বানন্দের ছু'হাত তুলে বলা উচিত ছিল "হে সন্ন্যাসী, ফিরে যাও, যেহেতু আমি গৃহী, তুমি সন্ন্যাসী ; গৃহীর পক্ষে সন্ন্যাসী হইতে দীক্ষা লওয়া নিষেধ।" কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেই সন্ন্যাসী বলিলেন—

> কিং বিদ্যোপার্জ্জনৈঃ কার্য্যং লিপ্যা বা কিং প্রয়োজনং।
> মন্ত্রং দদামি তে বৎস, সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কং॥
>
> (সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিনী)

তিনি কি করিলেন? (তদৈব তাস্ত দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরু বিচারণং) গুরু বিচার না করিয়া তন্মুহূর্ত্তে তাঁহা হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। যে দীক্ষার ফলে আজিও মেহারে শত শত নরনারী ধুল্যবলুণ্ঠিত হইতেছেন, তাহা অশাস্ত্রীয় হইয়াছিল কিনা তাহা শাক্তগণ বিচার করিবেন। প্রবাদ এই, ঐ সন্ন্যাসী (স্বয়ং মহাদেব) যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন তাহাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইয়াছিল কিনা তাহার চিন্তার ভার তান্ত্রিকগণের উপর রহিল। আধুনিক যুগের কথা আর কি বলিব? ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বারদীর

ব্রহ্মচারী, তোতাপুরী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, পাহাড়ী বাবা, কাঠিয়া বাবা, স্বামী ভোলানন্দগিরি, গম্ভীরানাথ বাবা, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণের কত শত শত গৃহী-শিষ্য রহিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেহ কি বলিতে সাহস করেন ইঁহারা সকলেই উন্মার্গগামী ভণ্ড প্রতারক? অথবা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করতঃ তাঁহাদের চরণাশ্রিত শত শত গৃহস্থ ভক্তগণকে অকূলে ভবসাগরে ডুবাইবার জন্য ইঁহারা দলবদ্ধ হইয়াছিলেন? হে বিরুদ্ধবাদী চিন্তাশীল ধীমান্, একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, ভ্রান্ত কে,—আপনি, না মহাপুরুষগণ! যে ভেলা আশ্রয় করিয়া শত শত যাত্রী পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন আপনি সে ভেলা অবলম্বন করিবেন, না, যুক্তি তর্ক দ্বারা তাহা সচ্ছিদ্র প্রতিপন্ন করিতে এ পারে বসিয়া থাকিবেন? বাস্তবিক পৌরাণিক ও আধুনিক যুগের উল্লিখিত আদর্শ সমূহ দর্শন করিয়াও 'গৃহস্থের গুরু সন্ন্যাসী হওয়া অশাস্ত্রীয়' বলিয়া যাঁহারা বৃথা আপত্তি করেন কিংবা সরল বিশ্বাসী ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম বিশ্বাসে বাধা জন্মান, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে সেই সে অতিবুদ্ধি শিয়ালের কথা মনে পড়ে। নিজ কর্ম্ম দোষে চতুষ্পাদাবদ্ধ এক শিয়াল নদীজলে ডুবিতে ডুবিতে স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আর চিৎকার করিতেছে, "হায়, হায়, সংসার রসাতলে যায়।" তীরস্থিত অন্য শিয়াল তাহা শুনিয়া ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, "কিহে বাপু, নিজ কর্ম্ম দোষে তুমিই যে রসাতলে যাইতেছ, সংসারটাত ঠিকই আছে।"

গুরু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গৃণাতি উপদিশতি যঃ সঃ, অর্থাৎ যিনি উপদেশ দেন। যিনি যে বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তিনিই সে বিষয় উপদেশ দিবার অর্থাৎ গুরু হইবার উপযুক্ত। সুতরাং আধ্যাত্মিক সর্ব্বোচ্চ উন্নতি লাভের প্রত্যাশায় গুরুকরণ করিতে হইলে প্রকৃত

জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী, ব্রহ্মনিষ্ঠ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত মহাপুরুষগণকেই বরণ করা উচিত ইহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান সমাজে যে সকল ব্যবসায়ী কুলগুরু (বা পৈত্রিক গুরু) আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই পাঠশালার 'গুরু মহাশয়'। ইহাদের নিকট বাল্য-শিক্ষার 'ক খ' পাঠ ভিন্ন উচ্চ আদর্শের পাঠের আশা—

প্রতিবিম্ব-শাখা ফলিত ফলাস্বাদনবৎ দুরাশা মাত্র।

কুল-গুরু অর্থাৎ পৈত্রিক গুরুত্যাগে কোন প্রত্যবায় আছে কিনা ?

এইক্ষণ কুল-গুরু বা পৈত্রিক গুরু সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সাধারণতঃ কুলগুরু ত্যাগের যে বিভীষিকা তাহার মূল ভিত্তি নিম্নশ্লোকগুলি হইতেই উত্থিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

পৈত্রং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্বৈপাপমোহিতঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্ক তারকং॥ (পিচ্ছিলা তন্ত্র)
তস্মাৎ গুরুবংশ জাতং বয়োঽল্পমপিপণ্ডিতং।
গুরুং কুর্য্যাত্তু দীক্ষায়ামবিচার্য্য গুরো কুলং॥ (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ)

প্রথম শ্লোকের অর্থ "যে ব্যক্তি পাপমোহিত হইয়া পৈত্রিক কুল-গুরু ত্যাগ করে সে চন্দ্র তারকার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে।" এস্থলে প্রধান লক্ষ্যের বিষয় 'পাপমোহিত' অর্থাৎ যে পাপে পতিত হইয়া মোহবশতঃ বা অধর্ম্ম বুদ্ধিতে গুরুত্যাগ করে। এ স্থলে বুঝিতে হইবে গুরু বংশে উপযুক্ত গুরু আছেন, কিন্তু শিষ্য পাপবুদ্ধির দোষে গুরুর

উপযুক্ততা সত্ত্বেও তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে। ইহাতে যে শিষ্যের নিশ্চয়ই অকল্যাণ হইবে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? কিন্তু যদি কেহ পাপ-মোহিত না হইয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভার্থ সরল ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বিচার পূর্ব্বক পৈত্রিক গুরুবংশে উপযুক্ত ব্যক্তি না পাইয়া অন্য উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তবে কোন্ শাস্ত্রের কোন্ নীতির বলে তাঁহাকে নরকে যাইতে হইবে? যিনি ধর্ম্মরাজ তিনিইত বিচার করিয়া নরকে পাঠাইবেন। প্রাণের অন্তরতম ভাব না বুঝিয়া শুধু গুরুত্যাগ রূপ বাহ্যিক কর্ম্মের অপরাধ দ্বারা তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যের বিচার করেন, একলঙ্কে বোধ হয় কেহই ধর্ম্মরাজকে কলঙ্কিত করিবেন না।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ গুরু বংশে 'পণ্ডিত' ব্যক্তি থাকিলে গুরুকুল বিচার না করিয়া ঐ পণ্ডিত ব্যক্তি বয়োকনিষ্ঠ হইলেও দীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিবে। এস্থলে 'পণ্ডিত' শব্দ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গুরুকুলে পণ্ডিত ব্যক্তি থাকিলে অবশ্যই তাঁহা হইতে দীক্ষা লওয়া উচিত। কিন্তু পণ্ডিত কাহাকে বলে? যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই পণ্ডিত বা বিদ্বান্। যাঁহারা সংস্কৃত টোল বা বিদ্যালয় হইতে দু'একটা পাশ করিয়া উপাধি ধারণ করিয়াছেন অথবা যাঁহারা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ 'বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখ্যানে কৌশলং' গুণ সম্পন্ন তাঁহারা কখনও পণ্ডিত পদবাচ্য নহেন। "যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্," "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" সুতরাং যে স্থলে ঐরূপ 'পণ্ডিত' গুরুর অভাব সে স্থলে গুরুত্যাগে কোন দোষ ঘটিতে পারে না। যেহেতু গুরুবংশে উপযুক্ত গুরু না থাকিলে গুরুত্যাগের উপদেশও আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই।

গুরু-গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনুশাসন।

অথো যো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষমস্তং ত্যজেৎ গুরুং।
অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নঞ্চ যথা সন্ত্যজতি প্রিয়ে॥
জ্ঞানত্রয়ং যত্রাভাতি স গুরুঃ শিব এবহি।
অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনো ব্রজেৎ॥ (কামাখ্যা তন্ত্র)
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধো তথা শিষ্যো গুরুগুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥ (ইতি তন্ত্র)
যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিত্থাং লভেৎ প্রিয়ে।
তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরু বিচারণং॥ (সিদ্ধজামল)

উদ্ধৃত শ্লোক সমূহের সার মর্ম্ম এই:—যে সকল গুরু অক্ষম, জ্ঞানদানে অসমর্থ, কেবল অর্থের প্রত্যাশী ও জ্ঞানহীন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু শিষ্য যে স্থানে জ্ঞানী গুরু পাইবে, মধু লাভের প্রত্যাশী মধুমক্ষিকার পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমনের ন্যায়, এক গুরু হইতে অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যদি সৌভাগ্য বশতঃ কাহারও তদ্রূপ গুরু-সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহা হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে সময়ের প্রতীক্ষা বা গুরুবিচার করিবে না। কুল-গুরুর (পৈত্রিক গুরু) লৌহ শৃঙ্খলে আজীবন আবদ্ধ থাকাই যদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় হইত তবে এই সরল উদার নীতির ব্যবস্থা হইল কেন? আরো দেখুন, যদি পৈত্রিক গুরু মাত্রই ত্যাগ করা শাস্ত্রের নিষেধ হয় তবে যে শাস্ত্রে 'নিন্দ্য-গুরু' বর্জ্জনের ব্যবস্থা আছে তাহার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? তথা জামলে—

অভিশস্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা।
ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরু নিন্দকং॥
জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।
সদা মৎসরসং যুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জ্জয়েৎ॥

গুরু-পুত্র যদি উল্লিখিত দোষযুক্ত হয় তখন শিষ্য-পুত্রের উপায় কি? যদি কুলগুরু মাত্রই বর্জ্জন দোষাবহ হয় তখন ত ভাল মন্দ বিচার হইতে পারে না। শত দোষ থাকা সত্ত্বেও হিন্দু শাস্ত্রে 'নিন্দ্য-পতি' ও তাহার বর্জ্জনের ব্যবস্থা দেখা যায় না, কিন্তু গুরু সম্বন্ধে 'নিন্দ্য-গুরু' ও 'গুর্ব্বন্তরং গচ্ছেৎ' দ্বারা পরিষ্কার রূপে সূচিত হইতেছে যে হিন্দুস্ত্রীর স্বামীবর্জ্জনাক্ষমতার ন্যায় গুরুত্যাগ অসম্ভব বা অশাস্ত্রীয় নহে। তাই তন্ত্রও সাবধান করিতেছেন, দেখিও মুর্খের নিকট যাইও না; যে হেতু—

"অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মুর্খং ন মূর্খো মূর্খমুদ্ধরেৎ"।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টবাসী, তাঁহার পৈত্রিক গুরুও শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ঈশ্বর পুরীকে গুরুত্বে বরণ করেন তখন কি তিনি কুলগুরু ত্যাগরূপ মহাপাতকের কথা বিস্মরণ হইয়াছিলেন? অথবা তিনি কি শাস্ত্র ও সদাচারের অমর্য্যাদা করিয়া এই অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন? এস্থলে সেই ব্রাহ্মণ-কুল-গৌরব সিদ্ধ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের দৃষ্টান্তটাও বিশেষ উল্লেখ করি। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর কুলগুরু ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে দীক্ষা লওয়াতে গুরুত্যাগ জনিত মহা রৌরবে পতিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা সর্ব্বানন্দকরী মা মেহারেশ্বরীর প্রিয় ভক্তগণই স্থির করুন। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই:—গুরুকরণ বা কুল-গুরু ত্যাগ বিষয়ে যিনি যাহাই বলিতেছেন, সকলেই শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন। প্রথমতঃ, শাস্ত্র-বারিধি মন্থন করা সকলের পক্ষে সহজ বা সম্ভব নহে, দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রার্থ লইয়া প্রায়ই মতানৈক্য ঘটিয়া থাকে। আইনের ধারার প্রকৃত মর্ম্ম লইয়া

যখন দুই পক্ষের পরস্পর বিরুদ্ধ মত উপস্থিত হয় তখন সর্ব্বোচ্চ আদালতের নজিরই প্রামাণ্য হয়। তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত বিষয় লইয়া যখন সকলেই শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন তখন শাস্ত্র ব্যাখ্যানে নিশ্চয়ই কোন পক্ষ ভুল করিয়া থাকিবেন, এমতাবস্থায় সাধু মহাজন-অনুসৃত আচরণই অন্ধের যষ্টি স্বরূপ একমাত্র অবলম্বনীয় ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। মহাজন যেন গতঃ সঃ পন্থা॥

ত্রেতার দশরথ, দশানন, জনক; দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ-মহারাজ, কলির শ্রীমন্মহাপ্রভু ও সর্ব্বানন্দ ঠাকুর এবং আধুনিক সময়ের তোতাপুরী, পরমহংস প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য অবতার ও মহাপুরুষগণ যে সকল আদেশ, উপদেশ ও আদর্শ দিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা শাস্ত্রার্থ বা ধর্ম্ম জীবন লাভের সহজতর উপায় আছে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় তাঁহাদের আদেশই শস্ত্র-বিধি, আদর্শই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা এবং উপদেশই প্রকৃষ্ট-পন্থা। ইঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ ব্যতীত ধর্ম্ম জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভের চেষ্টা 'মৃগ-তৃষ্ণা-জলং পিত্বা তৃপ্তি' লাভ সদৃশ বিফল প্রয়াস মাত্র। তাই আবার বলি—

'মহাজন যেন গতঃ সঃ পন্থা'। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'॥

মহাজনানুসৃত পথই প্রকৃত পথ, অমৃতত্ত্ব-প্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরি ওঁ তৎসৎ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বামীজী মহারাজের জীবন বৃত্তান্ত।

স্বামীজী মহারাজের জীবন বৃত্তান্ত সম্যক বিবৃত করা সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি কাহাকেও নিজ জীবন বৃত্তান্ত কোন দিনই বলেন নাই; পর্ব্বত গাত্র ভেদ করিয়া কীটের প্রবেশ বরং সম্ভব, কিন্তু তাঁহার সাধন সময়ের বৃত্তান্ত ও যোগৈশ্বর্য্য বিষয়ক কথা অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। কেহ নিতান্ত নাছাড়বান্দা হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিতেন, নতুবা অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ঐ কথা উপেক্ষার অন্তরালে ফেলিয়া দিতেন। তবে ভাগ্যক্রমে প্রসঙ্গচ্ছলে দুই এক কথা যাহা প্রচ্ছন্ন ভাবে বলিতেন অথবা তাঁহার প্রিয় সহচরগণের মুখে যাহা কিছু অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এস্থলে বিবৃত করা হইল।

পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত লুধিয়ানা জিলার ক্ষুরদ নামক গ্রামে স্বামীজী মহারাজের জন্ম হয়, তাঁহার পিতার নাম ব্রহ্মদত্ত, মাতার নাম নন্দাদেবী; ব্রহ্মদত্ত সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ও হিন্দু ধর্ম্মে একান্ত বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। মাতা নন্দাদেবীও স্বামীর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মে

তাঁহার সহধর্ম্মিনী রূপে বিরাজ করিতেন। স্বামীজী মহারাজই তাঁহাদের প্রথম সন্তান; তাঁহারা উভয়েই বিশেষ শিব-ভক্ত ছিলেন, বোধ হয় তজ্জন্যই তাঁহাদের প্রথম সন্তানের নাম ভোলানাথ রাখিয়াছিলেন।

তিনি বাল্যকাল হইতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ভাবে থাকিতে ভালবাসিতেন। গ্রামে কোন সাধু সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে বালক ভোলানাথই তাঁহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাহাতেই সুখ পাইতেন। এইরূপে সাধু ও সন্ন্যাসী সঙ্গলাভ করায় বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যদিও পিতামাতার ঐকান্তিক আগ্রহে ভোলানাথ উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন তথাপি সে বন্ধন তাঁহাকে সংসারে আটকাইয়া বেশী দিন রাখিতে পারে নাই। তিনি বোধ হয় চতুরাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিন বৎসর মাত্র দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিয়া পস্থানা আশ্রমের সিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী গোলাপ গিরিজির নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পস্থানা আশ্রম কুরুক্ষেত্র হইতে ৭।৮ মাইল দূরে অবস্থিত। মহাত্মা ভগবান্ গিরি ঐ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাদ এইরূপ, মহাত্মা ভগবান্ গিরি পস্থানা আশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান কালীন, তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দর্শনে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। হিন্দু মুসলমান বহুলোক তাঁহার শিষ্য হইল। ক্রমে এই কথা তৎকালীন দিল্লির বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে, বাদসাহ ঐ সাধুরূপী কাফেরের গর্দ্দানা আনিতে হুকুম দিলে, জল্লাদ সাধুর শিরশ্ছেদ করিতে আসিয়া দেখে সাধু দুই টুক্‌রা হইয়া পড়িয়া আছে। জল্লাদ অচিরে গিয়া এই সংবাদ বাদসাহকে জানাইল। বাদসাহ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাঠাইলেন; ঐ ব্যক্তি আসিয়া দেখে সাধু গড়গড়িতে তামাক টানিতেছেন। বাদসাহ পুনরায় জল্লাদকে হুকুম দিলেন, "উহাকে ছয় টুক্‌রা করিয়া আন।"

জল্লাদ আসিয়া দেখে সাধু ছয় টুক্‌রা হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, বাদসাহ এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং সাধুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে আশ্রম স্থাপনার্থ ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৪৪০০ বিঘা জমি নিষ্কর নাখেরাজ দান করেন। পন্থানা আশ্রম হইতে ১½ মাইল দুরে নিথড়ু গ্রামে মহাত্মা গোলাপ গিরির সমাধিস্থান আজিও বিদ্যমান আছে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতেই ভোলানাথের নাম হইল ভোলানন্দ গিরি। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনের কঠোরতা আরম্ভ হয়।

স্বামীজী মহারাজ গুরুর আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতেন। আশ্রমস্থ গোরক্ষণ, দুগ্ধ দোহন, দুগ্ধ মন্থন করতঃ মাঠা ও মাখন প্রস্তুত করণ, আশ্রম পরিষ্করণ, কূপ হইতে জলোত্তোলন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য তাঁহার নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতেন। গুরুজীর জন্য আহার্য্য সামগ্রী রন্ধন করিয়া বাসনাদি নিজেই মর্দ্দন করিতেন। গুরুজীর আদেশ ছিল রাত্র ৩টার সময় শয্যা ত্যাগ করা; তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এনিয়ম প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। রাত্র তিনটার সময় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করতঃ নিজ সাধন ভজনে বসিতেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। গুরুদেব এবং সমাগত সাধু বৃন্দকে ভোজন করাইয়া অবশেষে গুরুর প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। মধ্যাহ্নে ভোজনান্তে শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। অপরাহ্ণে আবার আশ্রমের কার্য্য ও সন্ধ্যার সময় শিবারাত্রিকাদি সমাধা করিতেন। উৎকট সাধনা, তীব্র বৈরাগ্য, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও একনিষ্ঠ গুরু সেবা ক্রমে তাঁহাকে সাধন পথে অগ্রসর করাইতে লাগিল। তিনি গুরুজীর একান্ত প্রিয় পাত্র হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারই আদেশ ক্রমে তিনি দেশ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। এই সময় তাঁহার কোন গাত্রাবরণ ছিল না। একমাত্র

কৌপীনই ছিল। হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু ও কটীদেশে কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া তিনি সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ক্ষুধায় মাধুকরী, তৃষ্ণায় অঞ্জলি ভরা বারি, ইহাদ্বারাই জীবন ধারণ করতঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, দেশ হইতে দেশান্তর, নদনদী কান্তার পাহাড় পর্ব্বত গুহা অতিক্রম করিয়া ভারতের বিভিন্ন দেশ সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া ছিলেন।

প্রবাদ আছে কাশী বিশ্বেশ্বর মন্দিরে ভোলানন্দকে দর্শন দিয়া ছিলেন। এই ভাবে তীর্থ পর্য্যটন করতঃ হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ বদ্রীনারায়ণ, কেদার, গঙ্গোত্তরী প্রভৃতি দুরারোহ স্থল তীর্থ সমূহ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই ভাবে নানাদেশ পর্য্যটন করতঃ হরিদ্বারে বিল্বকেশ্বর পাহাড়ের মধ্যস্থ এক অনতিবিস্তৃত গুহায় দ্বাদশ বৎসর সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। ঐ গুহা এখনও ঠিক সেই ভাবেই শোভা পাইতেছে, বিগত ১৩৩৩ সনের কুম্ভে তিনি সশিষ্য মধ্যে মধ্যে তথায় পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন, এবং নিজ সাধন গুহার নিকট গিয়া কিছু ফুল বিল্বপত্র ছড়াইয়া আসিতেন। এই স্থানের সাধন অবস্থায় অনেক আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা ঘটিত, তাহা পশ্চাল্লিখিত হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার সাধন গুহার নিকট চাঁড়িতে করিয়া জল রাখিয়া দিতেন, ঐ গুহার দরজার নিকট বাঘ আসিয়া বসিয়া থাকিত। বিশ্রামান্তে যাইবার সময় ঐ চাঁড়ি হইতে জল খাইয়া যাইত। ক্রমে তাঁহার মহিমা চতুর্দ্দিকে প্রচার হইতে লাগিল; গৃহস্থ, সাধু, সন্ন্যাসী সকলেই তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া সুখী হইতেন। তাঁহার সরলতা, উদারতা, অশ্রুত-পূর্ব্ব শাস্ত্র-ব্যখ্যা শুনিয়া সকল শ্রেণীর সাধকই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

সাধুগণ তাঁহাকে মণ্ডলেশ্বরের পদে বরণ করিলেন। অতঃপর প্রত্যেক পূর্ণকুম্ভেই সাধুগণ তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কুম্ভ-স্নান করিতেন। বিবিধ মণি মাণিক্য খচিত গাত্রাবরণে শোভিত অতিকায় ঐরাবত পৃষ্ঠে

স্বামীজী মহারাজ যখন শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হইতেন, তখন যে কি এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ পাইত, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

তিনি এতদিন পশ্চিমাঞ্চলের সাধু মহলেই সুপরিচিত ছিলেন, বাঙ্গালী তাঁহাকে চিনিত না। একবার প্রয়াগের এক কুম্ভে বাঙ্গালীর গৌরব ভক্ত চূড়ামণি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, তদীয় পত্নী যোগমায়া দেবী, পুত্র যোগজীবন গোস্বামী ও অপরাপর কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিবেণীর চরায় সাধুদের ভিতরে তাঁবু ফেলিয়াছেন, একে মছ্‌লী খোর বাঙ্গালী, তাহাতে আবার সস্ত্রীক, সাধু মহল হইতে তাঁহার এভাবে সাধুদের সহিত বাস সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি উঠিল, একমাত্র স্বামীজী মহারাজের চেষ্টায় সাধুদের মধ্যে গোস্বামী প্রভুর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি, সাধুগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে গোস্বামী একজন উচ্চদরের ভক্ত সাধক, স্ত্রী সঙ্গে রাখিতে সমর্থবান্‌-ব্যক্তি, তাই তাঁহার সঙ্গে স্ত্রী আছে; মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মুখেই বাঙ্গালী স্বামীজী মহারাজের প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে বাবু কৈলাশচন্দ্র দাস প্রভৃতি কতিপয় বাঙ্গালী ব্যতীত অতি অল্প লোকই তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবগত ছিল।

স্বামীজী মহারাজ প্রথম অবস্থায় যখন কলিকাতায় আসিতেন, গঙ্গার নিকটবর্ত্তী ইটখোলার অনতিদূরে অবস্থান করিতেন। এই সময় বোধ হয় লোকচক্ষু হইতে লুক্কায়িত থাকিবার উদ্দেশ্যেই যেখানে সেখানে, গঙ্গার ধারে, রাস্তার পার্শ্বে, ড্রেনের নিকট পড়িয়া থাকিতেন। ক্রমে যখন তিনি লোক সমাজে পরিচিত হইয়া উঠিলেন, তখন কতিপয় ভক্তের ঐকান্তিক চেষ্টায় ২১১নং হেরিসন রোডের তেতালায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সময় হইতে প্রায় শীত ঋতুতেই তিনি ঐ বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। এই সময় তাঁহার নাম শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভিতর

বিশেষ ভাবে প্রচার হইতে লাগিল। তাঁহার সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান, উদার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা, অখণ্ডনীয় অথচ সরল যুক্তি, চিত্তমোহন সুমধুর ভক্তি-কথা শুনিয়া ক্রমেই শিক্ষিত সমাজ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ, কেশব সেন, সাধু তোতাপুরীর সঙ্গে প্রায়ই ঠাকুরের সাক্ষাৎ ও প্রসঙ্গাদি হইত।

১৩১৯ সনের শ্রাবণ মাসে পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামে 'মহাপুরুষ বাণী'র লিথক স্বামীজী মহারাজের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্তের বাটীতে পদার্পণ করেন।

তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে ভক্ত শিষ্যগণের ঐকান্তিক প্রার্থনায় ২।৩ বৎসর অন্তর একবার করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে ঘুরিয়া যাইতেন।

১৩৩৫ সনের ফাল্গুন মাসে তিনি শেষবার পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণে বাহির হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তথা হইতে ফিরিবার পথে তুঙ্গেশ্বর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, মাদারীপুর, হইয়া বাজিতপুরে শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে মুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তথা হইতে বরিশাল ও কলিকাতা হইয়া হরিদ্বার উপস্থিত হন, এই ভ্রমণ উপলক্ষে যে যে বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করা হইল।

বঙ্গদেশে এই যাত্রাই ঠাকুরের শেষ যাত্রা, হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেহ রক্ষার পূর্ব্ব দুই দিন হইতে ঠাকুরের শরীর একটু অসুস্থ হইয়া পড়ে। শ্বাস কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা ও palpitation ছিল, ডাক্তার শরচ্চন্দ্র দত্ত তাঁহার চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সর্ব্বদাই প্রসঙ্গাদি করিতেন, শরীরের অসুস্থতা দেখাইয়া কেহ কিছু বলিলে বলিতেন—"এ দেহ কিছু নয়, থাকিবার জিনিষ নহে, কাহারও থাকিবে না।" একদিন শরৎ বাবুকে বলিলেন,—"দেখ, হাম্ ফিন লেকৃড়া হোনে শকৃতা হায়" (আমি পুনঃ বালক হইতে পারি)। তাহাতে শরৎ

বাবু বলিলেন—"আপনি ইচ্ছা করিলেইত পারেন।" আর একবার অসুস্থতার সময় বলিয়াছিলেন "মেরা নব কলেবর হো গিয়া, তুম লোক্‌কা কুছ ডর নেহি" (আমার নূতন শরীর হইয়া গিয়াছে, তোমাদের কোন ভয় নাই) ; এবার কিন্তু ঠাকুর বলিলেন—"আউর এ বেমারি আরাম নেহি হোগা।" দেহ রক্ষার পূর্ব্বদিন রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত পঞ্জাব দেশীয় এক সাধুর সহিত ব্রহ্ম বিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গাদি করিলেন। তৎপর ঘুমাইলেন। বরাবর যেমন রাত্র ৩টার সময় উঠেন, ঐ রাত্রেও ঠিক সেই সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শৌচ ও স্নানাদি সমাপন করিয়া গুহায় প্রবেশ করিলেন। সকালে গুহা হইতে বাহিরে আসিলে দলে দলে সাধুগণ দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন, জনৈক সাধক সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আপকা ক্যায়া তক্‌লিফ হ্যায় ?"

তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"শুদ্ধ নির্ব্বিকার, কেয়া তক্‌লিফ ?" আজ তাঁহার আদেশক্রমে আশ্রমে মহারুদ্র মন্ত্র ও শিবোঽহং মন্ত্র সর্ব্বদা পাঠ হইতেছিল, স্বামীজীর মুখ হইতেও অনবরত "শিবোঽহং,' 'শুদ্ধোঽহং,' 'নির্ব্বিকারোঽহং' বাক্য উচ্চারিত হইতেছিল। রাত্রে palpitation একটু বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র। রাত্র ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত একটু ঘুমাইলেন। ৩টা ৪০ মিনিটে সময় উঠিয়া জল চাহিলে তাঁহাকে বেদানার রস দিতে উদ্যত হওয়ায়, তিনি গঙ্গাজল চাহিলেন। জল আনা হইল, তিনি উঠিয়া নিজে গ্লাস ধরিয়া জলপান করিলেন, তৎপর বলিলেন, 'আউর দেয়গা ?' বলা হইল, 'থোড়া বাদ; দেয়গা,' তিনি 'আচ্ছা' বলিয়া গ্লাস ফিরাইয়া দিলেন এবং 'শিবোঽহং' 'নির্ব্বিকল্পোঽহং' বলিতে বলিতে এই নশ্বর দেহ ছাড়িয়া মহা সমাধিতে প্রবেশ করিলেন।

১৩৩৬ সনের ২৪শে বৈশাখ চৈত্রীয় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ৩টা—৪৫ মিঃ সময় স্বামীজী বিদেহ মুক্তিলাভ করিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, হরিদ্বার ঋষিকেশ হইতে সাধু মহান্ত মণ্ডলেশ্বরগণ আসিয়া ঐ দেহের পূজা করিলেন, তৎপর হরিদ্বার ক্ষেত্রে শোভাযাত্রা করিয়া ভীমগড়ায় কালীকুণ্ডে তাঁহাকে জল সমাধি দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম জীবনের মূলভিত্তি-গঠনে স্বামীজীর শিক্ষা।

সংসার ও ধর্ম্ম দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিষয় এবং একে অন্যের পরিপন্থী, ইহাই আমাদের প্রচলিত ধারণা। সংসার কর্‌তে হ'লে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভু'লে যেতে হবে আর ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্‌তে হ'লে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হ'তে হবে, ইহাই আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বালক কি যুবকদের মধ্যে কোন ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠান দেখিলে আধুনিক শিক্ষিতগণ বলিয়া থাকেন—ধর্ম্মকর্ম্ম সব বুড়োদের কাজ, "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"। এখন পরীক্ষায় পাশ কর, তারপর সংসার কর, অর্থোপার্জ্জন কর, খাও দাও মজা লুট, তারপর যখন বুড়ো হবে তখন জপের মালা হাতে নিও, সংসার ছেড়ে দিও, বেশ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্‌বে"। অর্থাৎ যতদিন না চলচ্ছক্তি রহিত বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত হবে, ততদিন ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারিও না, যখন দেখ্‌বে ছলে বলে কৌশলে অর্থোপার্জ্জনের শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে,—"শেষের-সে-দিন" ক্রমে ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন ধর্ম্ম কর্ম্মে মনোযোগ কর্‌বে,

যোগ তপস্যা আরাধনা যদি কিছু করতে হয়, করবে ইত্যাদি",—স্বামীজী মহারাজ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি যে জীবনের সকল কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত ঐক্য রাখিয়া করিতে হইবে। সংসার ছেড়ে তবে ধর্ম্ম করবে, অথবা সংসার করতে হলে ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়ে দিতে হবে, তাহা ঠিক নহে। জীবনের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মই ধর্ম্ম বাদ দিয়ে হয় না। যতক্ষণ দেহ আছে,—দেহাত্ম-বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ সংসার থাকবেই। তিনি সংসার করতে বলেছেন 'রসবর্জ্জং' ভাবে,—'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'। তিনি নিজে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন। বহু শিষ্যের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সামান্য কয়েকজন ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও সন্ন্যাস দেন নাই।

পিতামাতা যখন সন্তান জীবনের প্রথম বীজ বপন করেন তখন হইতেই সংসার ও ধর্ম্ম একসঙ্গে চলিতে আরম্ভ করে, তাই তিনি পুংসবন কার্য্যের সময়ও গুরুমূর্ত্তি স্মরণ করতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই উপদেশ দিতেন। তাহার ফলে সন্তান সুন্দর ও সৎ হইবে বলিতেন। মাতার গর্ভাবস্থায় সৎগ্রন্থ পাঠ ও সদালাপ করতে এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে ছেলের সামনে ভগবৎ স্তোত্র, গীতা, অন্যান্য সৎ গ্রন্থাদি পাঠ করতে উপদেশ দিতেন। ছেলে কাঁদলে বা তাহাকে ঘুম পাড়াইবার সময়ে ভগবানের নাম যুক্ত সঙ্গীতাদি করতে বলতেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে তাহার নিকট সৎগ্রন্থাদি পাঠে ও সদালাপে তাহার মস্তিষ্ক (brain) উত্তম পরমাণু দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে, ছেলের মাকে বলিতেন—"দেখ, ছেলে যখন আত্মানন্দে হাত পা ছুড়িয়া হাসবে—খেলবে, তখন তাহার নিকট বসিয়া 'শিব, শিব' বলিয়া তাহার নাকের অগ্রভাগ টিপিয়া চোকা করিয়া দিবে। দেখবে

কেমন সুন্দর নাক হবে।” ক্রমে যখন শিশু কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌বে, তখন লিখা পড়ির সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ স্তোত্রাদি—যথা ‘গৌরীশঙ্কর, সীতারাম, রাধে রাধে শ্যাম শ্যাম ইত্যাদি’ শ্লোক কবিতা মুখস্থ কর্‌তে বল্‌তেন। অর্থোপার্জ্জনের সময়—ব্যবসায় বাণিজ্য কর্‌তে কর্‌তে সর্ব্বদাই নাম করার জন্য তাঁহার আদেশ ছিল।

মানুষ সাধারণতঃ ধর্ম্মের বহির্ব্বাস লইয়াই হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি, হট্টগোল করিয়া থাকে। সকলেই অট্টালিকার বাহ্যিক সৌষ্ঠব ও শিরোপরি বিচিত্র পতাকা উড্ডীয়মান দেখিতে চায়, কিন্তু ভিত্তির দৃঢ়তা বা স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অতি অল্প লোকই যত্ন লইয়া থাকে। বিশেষতঃ বাঙ্গালী চরিত্রে ধর্ম্মধ্বজিতা বা বাহ্যিক আড়ম্বরের আদর অত্যন্ত বেশী। ধর্ম্মের বড় বড় কথা বেশ মুখস্থ বল্‌ছে, কিন্তু মূলে হাত দিলে দেখা যায় অন্তঃসার শূন্য। গীতা, ভাগবত, উপনিষদের জটিল তর্ক, জীবের স্বাধীনতা, অবতার তত্ত্ব, লীলারহস্য, সৃষ্টি বৈচিত্র্য, এ সব বড় বড় তত্ত্ব-কথা লইয়া বেশ ব্যস্ত আছে, এমন কি রামকৃষ্ণাদি অবতারের কৃত কর্ম্মের সমালোচনা পূর্ব্বক তাঁহাদের কৈফিয়ৎ তলব করিতেও দ্বিধা বোধ করে না, কিন্তু “স্বীয় কর্ম্মে অনুষ্ঠানং কস্যচিত্ মহাত্মনঃ”। তজ্জন্য প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন ধর্ম্মের বড় বড় কথা কাহাকেও বলিতেন না। যে ক, খ জানে না, তাকে কলাপ ব্যাকরণ পড়াতেন না। তিনি দেখাতেন বালির চরার উপর যাহা ভিত্তি, তথায় অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। তাই তিনি কর্ম্মানুষ্ঠানের অতি সামান্য সামান্য কথা হইতে আরম্ভ করিতেন। আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি—প্রাচ্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বড় বড় পণ্ডিত ক্ষুরধার সম বুদ্ধির প্রাখর্য্যে বিরাট আয়োজনে, যুক্তি বাহুল্যের সমবায়ে প্রবল ব্যগ্রতা প্রযুক্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঠাকুরের সহিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের

নিগূঢ় তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু ঠাকুর সামান্য দু'কথায় যেন হেলায় অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাদের সব জটিল তত্ত্বের সুমীমাংসা করিয়া দিতেন। বিদায়ের কালে কিন্তু বড় বড় তত্ত্ব কথা বাদ দিয়া যিনি যতটুকু অধিকারী ঠিক ততটুকু কথাই বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের অ-আ পাঠ পড়াইয়া দিতেন। সময় সময় বহু দূরাগত দর্শক ফিরিয়া যাইবার সময় বলাবলি করিত—"অত বড় সাধুর নিকট গেলাম,—বড় বড় তত্ত্বের কথা, ভক্তির কথা শুনব—কিন্তু শুন্‌লাম কেবল "গালি দিও না, দিব্বি কর না, পিতামাতা গুরুজনকে প্রণাম কর, আয়ের দশমাংশ দান কর ইত্যাদি। এ সব নিত্য শোনা কথা শুনবার জন্যই কি অতবড় সাধুর নিকট গেলাম!"

এই যে মহামহীরুহ অশ্বত্থ বৃক্ষ—ইহার অতি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বীজ কণা বায়ু সাগরে উধাও হইয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যদি ভাগ্যক্রমে কোথাও উহা স্থিতি লাভ করে, তথায় মৃত্তিকা, জল, বায়ু সংযোগে অমর বৃক্ষে পরিণত হয়। মনুষ্য জীবনের বীজও তদ্রূপ; যদি তাহার প্রথম সূত্রপাত উত্তম ব্যবস্থাযুক্ত না হয় তবে সবই নিষ্ফল হয়। ক্ষুদ্রাদপি বীজের ভিতরই ফুলের সৌন্দর্য্য সৌরভ, পত্রের বিচিত্র আকৃতি, ফলের কষায় তিক্ত মিষ্টরস নিহিত থাকে। মনুষ্য বীর্য্যের প্রভাবে পিতার কোকড়ান চুলগুলিও পুত্রে বর্ত্তিয়া থাকে, সুতরাং মানবজীবনের বীজ বপনের আরম্ভ হইতে ক্রমে আশৈশব বৃদ্ধত্ব পর্য্যন্ত যেন সমস্ত সোপানগুলি উত্তম মসল্লাযুক্ত সুদৃঢ় ভিত্তি সম্পন্ন হয়, তিনি তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। জ্ঞান ভক্তি ভগবৎ-প্রাপ্তি বিষয়ক বড় বড় তত্ত্বোপদেশ ব্যতীত "গালি দিও না, জুয়াখেলা করিও না, গুরুজনকে প্রণাম করিবে, নাম ও দানে মতি রাখ" এই কয়টী ছোট খাট উপদেশ সকলকেই দিতেন। উপদেশ এসব ছোট খাট জীবনের নিত্য

সহচর উপদেশের প্রতি তিনি এতাধিক বিশেষত্ব কেন দিতেন তজ্জন্য ঐ কয়টী বিষয়ে দু'চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

কুবাক্য-কথন।

পরিবারের লোকদিগকে, এমন কি দাস দাসীকেও "শুয়র, পাঁজি, গাধা, লক্ষীছাড়া," এসব ভাষায় গালি না দিয়া "তুমি রাম হয়েছ", লক্ষ্মণ হয়েছ", "ঠাকুর হয়ে বসে আছ? সীতা হয়েছ, লক্ষ্মী হয়েছ" ইত্যাদি ভাষা দ্বারা ক্রোধ প্রকাশ কর্‌তে বল্‌তেন। বাক্য বিষ যে কি ভয়ানক তীব্র তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি বল্‌তেন "দেখ, এই বাক্য দ্বারাই রাবণ বিভীষণকে ব্যথা দিয়েছিল, তার ফলে রাবণবংশ ধ্বংস হল, সোণার লঙ্কা ছারখার হ'ল, আবার এই বাক্য দ্বারাই ধ্রুব, প্রহ্লাদ ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং কখনও কটুবাক্য বলিবে না। সংসারের যত অনর্থ, পারিবারিক যত অশান্তি, ঐ বাক্য প্রয়োগের অসংযমতার জন্যই ঘটিয়া থাকে; দেখ দুধ ও অম্ল কখনও একপাত্রে থাকিতে পারে না। কিন্তু মানুষের মুখে বাক্যরূপ অমৃত ও বিষ একত্রে মিশিয়া আছে। এ অবস্থায় বিষত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অমৃতেরই সদ্ব্যবহার কর।"

ঠাকুরের এই নীতি ধর্ম্মজীবনের ও সাংসারিক সুখের আদি ভিত্তি। স্বামীজী মহারাজের এই 'অ-আ' পাঠ যে পরিবার আয়ত্ত করিয়াছে সে পরিবারে যে কি বিমল শান্তি সুখ বিরাজ করিতেছে তাহা গৃহস্বামী ভিন্ন অন্যে বুঝিবার সাধ্য নাই।

জুয়াখেলা।

জুয়া খেলার ফল প্রতি দিবস হাটে বাজারে মেলায় সকলেই অনুভব করিতেছেন। অথচ ইহার প্রলোভন যে কিরূপ উন্মাদকারী, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। জুয়া খেলিতে গিয়া কত রাজা ফকীর হইয়াছে, কত অট্টালিকা ধূলিসাৎ হইয়াছে; কত কুরু কুল উৎসন্ন গিয়াছে, তাহা হাড়ে হাড়ে অনেকেরই জানা আছে। এ সব অনর্থ নিবারণের জন্য সর্ব্বদা সকলকে হুসিয়ার করিতেন।

গুরুজনকে প্রণাম।

গুরুজনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের যে স্বর্গীয় মাহাত্ম্য তাহা ঠাকুরের আদেশানুযায়ী যিনি কার্য্য করিয়াছেন, বা করিতেছেন, তিনি জানেন। যিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, পিতামাতা সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদের চরণে একবার না লুটাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে ছাড়িতেন না। তাঁহাব আদেশ ছিল প্রাতে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমে ভূমিকে, সূর্য্য-নারায়ণকে, তৎপর পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিতে হইবে। গুরুজনের নিকট আমরা যত অপরাধই করি না কেন, যদি একটিবার সাষ্টাঙ্গ হইয়া তাঁহার পায় লুটাইয়া পড়িতে পারি, তবে এমন পাষাণ কয়টী আছে, যে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারেন। ঠাকুর বলিতেন—"মাটীতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলে পৃথিবী দানের ফল হয়, আর যাঁহাকে প্রণাম করা হয়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চুয়াইয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়।" ঠাকুরের এই প্রণাম মাহাত্ম্য যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে সংসার ক্ষেত্রে বসিয়া স্বর্গীয় শান্তিসুধা উপভোগের কি এক গুপ্ত মন্ত্রই ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন।

আয়ের দশমাংশ দান।

তিনি সকলকেই আয়ের দশমাংশ ধর্ম্মার্থে দান করিতে উপদেশ দিতেন। গৃহিলোক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঢেকী, যাঁতা, চুলা, ঝাঁটা প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদাই জীবহিংসা করিয়া থাকে। যিনি সংসারের কর্ত্তা, তাঁহাকেই এই পঞ্চসূনা পাপের প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়। তন্নিরসনার্থ আয়ের দশমাংশ দানই শাস্ত্রের বিধান। তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালনের অসমর্থতার প্রতিকূলে আয়ের অসচ্ছলতার অজুহাত উপস্থিত হইলে তিনি বলিতেন, "প্রত্যেকের আয়কে চারি ভাগে ভাগ কর, একভাগ জমা রাখিবে, এক ভাগ রশুই খরচ—(ময় চাকর মজুরের খরচসহ), এক ভাগ ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষিকার্য্য ইত্যাদির জন্য, বাকী এক ভাগের দশ পয়সা বাবুগিরি বিলাসিতার জন্য, বাকী ছয় পয়সা ধর্ম্মার্থে দান করিবে।" 'আয়ের দ্বারা কুলায় না' বলিলে বলিতেন, "তোমার অধীনে ৫।৬৲ টাকা মাহিনার চাকর যদি স্ত্রী পুত্র পরিবার পালন হইতে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে পারে, তবে তুমি তাহা হইতে দশগুণ আয় করিয়াও কেন পারিবে না? যেমন আয় তদনুরূপ ব্যয় কর, সব দিক্ রক্ষা পাইবে। আয়ের দশমাংশ ভগবানের প্রাপ্য, তাঁহার পাওনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া নিবেনই। তুমি স্বেচ্ছায় দেও ত ভালই, না হয় কাণে ধরিয়া মামলা মোকদ্দমায়, কঠিন পীড়ায় নিগড়াবদ্ধ করিয়া বাহির করিয়া দিবেনই। উক্ত দশমাংশ সাধু, গরীব, অনাথ, রোগী ইহাদিগকে দিতে হইবে।"

ভগবন্নাম গ্রহণ।

হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান যে জাতির লোকই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাহাকেই তিনি ভগবানের যে কোন নাম নিয়মিত ভাবে লইতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "কলিতে একমাত্র 'নাম' আর 'দান'ই শ্রেষ্ঠ সাধন।" ভগবানের যে কোন নাম— মুসলমানের আল্লা, খ্রীষ্টানের গড্, হিন্দুর কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, রাম, গোবিন্দ যে কোন নাম—যাঁহার নিকট যাহা ভাল লাগে তাহাই নিতে বলিতেন। এই নাম নেওয়া সম্বন্ধে শুচি অশুচি কিংবা দেশ কালের উপর বেশী জোর দিতেন না। অবশ্য-কর্ত্তব্য-প্রাত্যাহিক প্রত্যূষ ও সায়ংকালীয় বিশুদ্ধতার সহিত শাস্ত্রানুযায়ী পবিত্রভাবে গুরুদত্ত ভজনকার্য্য নির্দ্ধারিত থাকিত। তদ্ব্যতীত হাটিতে হাটিতে, গাড়ীতে বসিয়া, এমন কি পায়খানায় গিয়াও নাম করিবার তাঁহার আদেশ ছিল। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করা এক শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা সকল মহাপুরুষগণই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন, তজ্জন্য তিনি এক সুকৌশল সকলকেই বলিয়া দিতেন। ধর্ম্মের খোলস লইয়া কলহপ্রিয় ধর্ম্মধ্বজী, কর্ম্মহীন, বাক্য বাগীশদের দুরবস্থা দর্শনে, তাঁহাদের ইহ-পরকালের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে তিনি যেরূপ ধীরভাবে কৌশলে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা যতই ভাবনা করা যায়, ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

আত্মানুষ্ঠান।

আমরা বাঙ্গালী, সাধারণতঃ পরের হাতে খেতেই ভালবাসি। আহারে, বিহারে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, ধর্ম্মকর্ম্মে প্রায়ই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। সামাজিক সামান্য দুর্নীতি দূর করিতে হইবে, তাও আইন পাশ করাইতে হয়। দিয়াশলাই কাঠি অবধি কল কব্জা, রেল মটর আমাদের দরজায় হাজির হবে, তবে আমরা বেশ ব্যবহার কর্‌তে পারব। ধর্ম্মকর্ম্ম, দেব আরাধনা, তাও গুরু পুরোহিতের মারফতে করাতে চাই। বাবু ভিতর বাটীতে চা, বিস্কুট, তাশ, পাশা, রঙ্গরসে ব্যস্ত, পুরোহিত ঠাকুর বাহির বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপে যজমানের উন্নতিকল্পে পূজা হোম করিতেছেন। গুরুকরণ ভিন্ন ধর্ম্মলাভ হয় না শুনিয়াছি; বস, ভাল করিয়া গুরুকরণ করিয়া লও, আর সব বোঝা ঐ গুরুর ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে খাও, দাও, মজা কর, নিজ কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা উঠিলে, বুক ফুলাইয়া বলে ফেলি "আমি অমুক গুরুর শিষ্য, আমার আবার করবার কি আছে? আমি ত আর যেমন তেমন গুরুর চেলা নহি যে আমার নিজেরও খাট্‌তে হবে, ইত্যাদি।" স্বামীজী মহারাজ কখনও এরূপ অলস কর্ম্ম বিমুখতার প্রশ্রয় দিতেন না। সংসারের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই স্বাধীনভাবে কর্‌ব, সুখে আহার বিহারের চেষ্টা দেখ্‌ব, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ছলে বলে কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করব, সুখ-দুঃখ, শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত হয়ে পড়ব, অভিমানের লেজে একটু পা পড়িলে অমনি ফোঁস করে উঠব, কিন্তু সাধন ভজনের বেলায় বড় বড় কথা বলে ফেলব,—"জীবের স্বাধীনতা নাই, যা' করেন সব ঈশ্বরই করেন, আমি সাধন ভজন করে কি কর্‌তে পারি" ইত্যাদি। "আমার ষ্টেটের মালিক আমি, কর্ত্তা আমি, ম্যানেজার আমি; খালি সাধন ভজনের জন্য গুরুদেবকে

আম্-মোক্তার নামা সম্পাদন করিয়া দিব।" ধর্ম্মকর্ম্মে এসব অলস কর্ম্ম-বিমুখতার প্রতি তিনি মোটেই সহানুভূতি দেখাইতেন না। তিনি বলিতেন, "তোমার দেহরূপ অশ্বকে খুব ভাল পুষ্টিকর খাদ্য পানীয় দিয়া সুস্থ ও তাজা রাখ। কিন্তু সাধন ভজনের বেলায় ষোল আনা কাজ হাসিল করিয়া ছাড়িয়া দাও " তাঁহার মতে মানব জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ বা ভগবৎ প্রাপ্তি তিনটী কৃপাসাপেক্ষ—আত্মকৃপা, গুরুকৃপা, ঈশ্বর-কৃপা। ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা প্রযুক্ত শ্রীগুরুচরণে আত্ম-সমর্পণ, তাঁহার বাক্যে নিষ্কপটভাবে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন, তাঁহার আদেশ উপদেশানুযায়ী সাধন ভজনাদি সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠান এসবই আত্মকৃপার অন্তর্গত। উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বানুকূল্য করা গুরুকৃপা। আত্মকৃপা ও গুরুকৃপার সহযোগ হইলেই ভগবৎ কৃপা অবশ্য-লভ্য হইয়া পড়ে। গুরুকৃপা ভিন্ন কোন ধর্ম্মকর্ম্মই হয় না, তাহা পূর্ব্বে উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে। সদ্‌গুরু আশ্রয় ব্যতীত শুধু স্বীয় চেষ্টায় মোক্ষপদ প্রাপ্তি ঘটিবে না, ইহা যেন শ্রীভগবানের এক বিশেষ বিধি।

যথা জাত্যন্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে
তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্পকোটিভিস্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে।

(ত্রিপাদ মাহানারায়ণোপনিষৎ)

যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তির কখনই রূপ জ্ঞান সম্ভব হয় না, তদ্রূপ গুরূপদেশ ভিন্ন কোটি কল্পেও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না।" গুরুকরণান্তরও আত্মকৃপা অর্থাৎ পুরুষকারের একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলিতেন—"ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব বিষয়েই পুরুষকারের দরকার। অর্থ লাভ, কামনা উদ্ধার, পুরুষকার ব্যতীত হয় না। মানুষ সততই ঐ ঐ বিষয়ে পুরুষকার আরোপ করিতেছে। কেবল কি ধর্ম্ম ও মোক্ষ বিষয়ে, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা

কঠিনতম—পুরুষকার থাকিবে না? ধর্ম্ম ও মোক্ষ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুরুষকারের দরকার।

ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য শুভবুদ্ধি হওয়া, তাহাও দেখি আত্মকৃপা বা পুরুষকার সাপেক্ষ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০।১০)

যাহারা আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনকারী, সেই সকল ভক্তগণকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ আগে ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া সন্তুষ্ট কর, পরে কি ভাবে তাঁহাকে পাইবে তদ্রূপ বুদ্ধি তিনিই যোগাইবেন।

শ্রীভগবানের কৃপাবারি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ষিত হইতেছে, যে স্থানে উপযুক্ত পাত্রাধার থাকে সেখানেই উহা ধৃত ও সঞ্চিত হইয়া থাকে।

হীন-বীর্য্য অলস কা-পুরুষ ব্যক্তি যে আত্ম-লাভে সমর্থ হয় না তাহা শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এত রুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্
তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ)

আত্মনিষ্ঠা জনিত বীর্য্য যাহার নাই সে এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। যে বিদ্বান্ আত্মবল, অপ্রমাদ, সন্ন্যাস-যুক্ত জ্ঞান-সহ যত্ন করেন তাঁহার আত্মাই সকলের আশ্রয়ভুত ব্রহ্মে প্রবিষ্টা হন।

ভগবান্ আত্মকৃপাবান্ ব্যক্তিরই যোগ-ক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, অলস কর্ম্ম-বিমুখের নহে।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥

(গীতা ৯।২২)

অন্য কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহারা আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করে আমি সর্ব্বতোভাবে মৎপরায়ণ সেই সকল ব্যক্তির যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকি।

ঠাকুর তাঁহার পদাশ্রিত শিষ্যগণকে আত্মকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ ও যত্নশীল করিবার জন্য গুরু-কৃপা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন—
"তোমরা চাও—

সাধন-ভজন, পূজন বিনা—
আমার গাঁজা ভিজবে কিনা ?"

না বাবা, তা হবে না, ও ভাবে গাঁজা ভিজবে না। বাবা ছেলের সাদি (বিবাহ) পর্য্যন্ত করাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু নাতি জন্মান ত ছেলেরই কাজ, তাও কি বাবা করে দিবে ?

দেহ রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, কেহ সমস্ত আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তোমার সম্মুখে ধরিতে পারে, এমন কি গ্রাস করিয়া তোমার মুখে পর্য্যন্ত তুলিয়া দিতে পারে কিন্তু চর্ব্বণ, গলাধঃকরণ তাহা ত নিজের করিতে হইবে।"

আত্মানুষ্ঠান-বিমুখতা-প্রসূত "গুরু করবেন" ব'লে যে একটা অলস ভাব-প্রবণতা আছে তাহা দূর করিবার জন্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন :—

"সাধন না ক'রে কেবল 'গুরু করবেন, গুরু করবেন' বল্‌লে কিছুই হবে না।......যতকাল অহংকার আছে, পুরুষকার আছে ততকাল গুরু করবেন বললে চলবে না। নিজে খাটো, নিজেরা না খাট্‌লে কিছুই হবে না। কেহ সাধ্যমত খাট্‌লেই গুরু তাহাকে সাহায্য করেন। গুরু

বাক্যই গুরু, গুরু যাহা বলে দেন তাহা করলেই গুরুকৃপা লাভ করা যায়। * * * তাঁদের আদেশ মত যদি কিছুই না কর তা হ'লে আর কি হবে? সর্ব্বদা সাধন কর, সমস্তই লাভ হবে"।

(সদ্‌গুরু-সঙ্গ ৪র্থ খণ্ড ৪১ পৃঃ)

স্বামীজী মহারাজ এ বিষয়ে মুখে বজ্রাপেক্ষা কঠোর হইলেও কার্য্যতঃ কুসুম অপেক্ষাও কোমল ছিলেন। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ কিরণেও শান্তির শীতল ছায়া পড়িত! কুলিশ কঠোর বাক্যের অন্তরালেও আশার সুশীতল ফল্গু প্রবাহিত হইত। তাঁহার এই অভয়বাণী সাধন-রত ভক্তগণ জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপেই অনুভব করিতেছেন। পশ্চাল্লিখিত "ঘটনাবলী" পাঠে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

তিনি কি ভাবে গুরুকৃপার অমিয় ধারা বর্ষণ করিতেন, তাহা সাধারণভাবে কাহাকেও বলিতে না চাহিলেও সময় সময় দুই একটী কথা বাহির হইয়া পড়িত :—ঐ সব সময় হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "তোমাদের কাজ তোমরা কর, আমি ত তোমাদের পশ্চাতে আছিই। তোমাদের ভিতর গুরু-শক্তির যে বীজ বপন করা হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার জল সিঞ্চন করিতে থাক। তাতেই সব কাজ হইবে। দেখ ছোট ছোট শিশু সন্তান পিতামাতা ভিন্ন কিছুই জানে না। পিতামাতাও ঐ সব শিশু সন্তানের সকল ভার নিয়া থাকেন,—আহার, পোষাক, যখন যাহা প্রয়োজন, সব তাঁহারা যোগাইয়া থাকেন। তদ্বৎ যে সব শিষ্য গুরুর উপর আত্মসমর্পণ করে, গুরুও তাহাদের সমস্ত ভার বহন করিয়া থাকেন। এমন স্থান আশ্রয় কর নাই, যে মধ্য পথে ফেলিয়া যাইবে।" জাহাজের মাস্তুল উপরি উপবিষ্ট কাক যেমন অজ্ঞাতসারে সমুদ্র পার হইয়া যায়, সদ্‌গুরু কৃপাশ্রিত শিষ্যও তদ্রূপ অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ ভব-জ..ধ অতিক্রম করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গলায় স্বামীজীর প্রভাব।

স্বামীজী মহারাজ পশ্চিম দেশীয় সাধু হইলেও বাঙ্গলার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দরদ ছিল। বোধ হয় এ কথা বলিলে অসত্য হইবে না যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর স্বামীজী মহারাজ ব্যতীত ধর্ম্ম বিষয়ে বাঙ্গালীর ভিতর আর কেহ এতদধিক প্রভাব বিস্তার করেন নাই। বাঙ্গলার এমন কোন সহর নাই, নগর নাই, গ্রাম নাই, পল্লী নাই, গল্লী নাই, যে স্থানে স্বামীজী মহারাজের নাম অজ্ঞাত অথবা ২।৪ জন শিষ্য সেবক না আছেন। বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ নর নারী তাঁহার অভয় চরণে আশ্রয় নিয়া জীবন ধন্য মনে করিতেছে। কি ধর্ম্ম মত গ্রহণে, কি রাজ-নৈতিক ব্যাপারে, কি সামাজিক বিষয়ে এতদধিক সংখ্যক বাঙ্গালী (বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজ) ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও নিকট মাথা বিক্রী করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মহাপ্রভুর সময় এরূপ কতকটা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গলায় তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাব বিস্তার করে নাই, এবং শিক্ষিতের সংখ্যাও এতদধিক ছিল না। শিক্ষা বলিতে এস্থলে পাশ্চাত্য শিক্ষার কথাই বলিলাম। কারণ এ শিক্ষার এমনই মাহাত্ম্য যে ইহা সর্ব্বদা হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া থাকে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দেয়। হিন্দুর বেদ পুরাণকে চাষার গান বলিয়া ব্যাখ্যা করে, যোগী ঋষি তপস্বি-গণকে ভণ্ড প্রতারক বলিয়া উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেয়, গুরু-করণ, মন্ত্র জপ অসভ্য ছোট লোকের কাজ বলিয়া ধারণা জন্মাইয়া দেয়। এ হেন প্রতিকূল শিক্ষা যেখানে যে সময় রাজত্ব করিতেছে সে সময় সেই শিক্ষাগর্ব্বে স্ফীত-বক্ষ বাঙ্গালী বাবুগণের মধ্যে তিনি যেরূপ একটা ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সদাচারের প্রবল বন্যা আনয়ন করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যই বটে! বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি ভূষণে ভূষিত,

উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী, আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, অধ্যাপক, ন্যায় দর্শন বেদ স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রকৃত জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী, যাঁহারা ধর্ম্মের কোমল কথায় একান্ত গলিয়া পড়েন না, পরন্তু অবিশ্বাস ও সন্দেহের নেহাইতে বাদ-বিতণ্ডার প্রচণ্ড মুদ্গরাঘাতে সর্ব্বদাই সাধু ও ধর্ম্ম-মতের পরীক্ষা করিতে অভ্যস্ত, এ হেন শিক্ষিত সমাজই স্বামীজীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রীতি ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক কথায়, তিনি বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে বাঙ্গলার হাওয়া বদলাইয়া দিয়া গিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালী ভক্তের একান্ত প্রার্থনায় তিনি ২।৩ বৎসর অন্তর যখন হরিদ্বার হইতে বঙ্গদেশে পদার্পণ করিতেন, তখন যে স্থানেই যাইতেন তাঁহার হাসিমাখা শ্রীমুখের অমৃত নিস্যন্দিনী বাক্য শুনিবার জন্য, এমন কি একটু দর্শন পাইবার প্রবল আশা বুকে লইয়া যে ভাবে জনবাহুল্য উপস্থিত হইত, তাহা যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই ধারণা করিতে পারিয়াছেন যে স্বামীজী মহারাজ বাঙ্গালী হৃদয়ের কত গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন। বিগত ১৩৩৫ সনের শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে বাজিতপুর (ফরিদপুর) মুক্তেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীযুক্ত নাগেশানন্দ-জীর প্রার্থনায় তথায় গিয়াছিলেন। যে কয়দিন তথায় ছিলেন—প্রতিদিন প্রায় ৪।৫ হাজার লোক বহুদূর হইতে পদব্রজে শুধু তাঁহার দর্শন অভিলাষে তথায় সমবেত হইত। তৎসময় তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় আগন্তুকগণ সব সময় তাঁহার দর্শন পাইত না। বহুলোক একত্র হইয়া "ঠাকুর দেখাও, ঠাকুর দেখাও" বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চ কোলাহল আরম্ভ করিলে তাঁহাকে তাঁহার কোঠা হইতে বাহির করিয়া বারিন্দায় আনয়ন করা হইত। হর্ষোৎকণ্ঠিত জনগণ তাঁহার দর্শন পাইবামাত্র উল্লাসে উচ্চ কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিত। ঠাকুরের অসুস্থতা প্রযুক্ত

বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিতে দেওয়া হইত না। এভাবে একদল ঠাকুরের পুণ্য স্মৃতি লইয়া চলিয়া গেলে আবার ক্ষণেকের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক পূর্ব্ববৎ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃরব করিতে থাকিত। এভাবে ঠাকুর দর্শনের একটা অভিনয় ঘটিয়াছিল। ১৩৩৩ সনের হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভের সময় প্রায় প্রত্যহই ষ্টেশন হইতে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় বাঙ্গালী স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইত এবং প্রাণের আবেগে একান্ত দরদী আপন জনের ন্যায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে 'বাঙ্গালীর ঠাকুর, বাঙ্গালীর ঠাকুর' বলিয়া কত আবদারের সহিত তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইত। তাহা দেখিয়া শুনিয়া মনে হইত স্বামীজী মহারাজ বুঝি বাস্তবিকই 'বাঙ্গালীর ঠাকুর' হইয়া বাঙ্গালীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার লিখিত সেই সে প্রয়াগ ধামের কুম্ভ মেলার কথা অনেকেই অবগত আছেন। সেই কুম্ভে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত মহাপুরুষকে মছ্‌লিখোর বাঙ্গালী বলিয়া সাধুগণ তাঁহাদের জমায়েতের মধ্যে তাঁহার তাঁবু ফেলিতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তখন একমাত্র স্বামীজী মহারাজই এহেন কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই চেষ্টায় বিভিন্ন দেশীয় সাধু জমায়েৎ মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী সাধুর তাঁবু উত্তোলন করিতে দিয়া সাধু মহলে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। আর এই সে হরিদ্বার ক্ষেত্র, সকল তীর্থের সেরা, ভারতের সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত সাধু মহান্তগণের মিলন স্থান, সেস্থানে বসিয়া ঐ হরিদ্বার, ঋষিকেশ, কৈলাশ, স্বর্গাশ্রমের সাধু, মহান্ত, মণ্ডলেশ্বরগণ এই সে দিন অভিষেক মণ্ডপে মিলিত হইয়া কাহার পূজা করিলেন? ঐ সকল সাধুগণ যাহাদিগকে 'মছলিখোর' বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহাদের লোটা বর্ত্তন পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে দেয় না, ইনি কি সেই বাঙ্গালীদের একজন নহেন? ঠাকুর দয়া করিয়া ১০০০ হাজার সাধু

দূরবর্ত্তী বাঙ্গলা দেশ হইতে তাঁহার প্রিয় পদাশ্রিত একজন উপযুক্ত বাঙ্গালীকেই * স্বর্গতুল্য তাঁহার হরিদ্বার আশ্রমের মহান্ত পদে মনোনীত করিয়া প্রকৃতই যে 'বাঙ্গালীর ঠাকুর' সেই নামের পূর্ণ সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। এখন একবার খাস বাঙ্গলার দিকে চাহিয়া দেখুন,—যে বাঙ্গালীর দন্ত পংক্তিতে আমিষের টুকরা লাগিয়া থাকে, যাহাদের রসনা মৎস্য মাংসের স্বাদে সদা উল্লসিত, যাহাদের প্রতি ধমনীতে আমিষ রসের জোয়ার ভাটা বহিতেছে, যাহাদের শুক্র শোণিত-মেদ-মজ্জা-অস্থি-মাংস আমিষ খাদ্যে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ, যে বাঙ্গলা দেশের প্রতি ধূলিকণা, আকাশ, বাতাস, আমিষ পরমাণুতে ভরপুর, যথাকার চিকিৎসকগণ কথায় কথায় মাংস যুষের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কাহারও একটু নিরামিষ ভোজনের ইচ্ছা হইলে, যথাকার পণ্ডিত মহাশয়গণ "বঙ্গে চ মৎস্যঃ সিদ্ধঃ" বচন আওড়াইয়া সে সংকল্পের মাথায় লগুড়াঘাত বসাইয়া দেন, সেই বাঙ্গলা দেশের বক্ষঃস্থলে আজ নিরামিষের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান। কত শত শত অশিক্ষিত অর্দ্ধ শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি,—মৎস্য মাংস বা ডিম্ব ভিন্ন যাহাদের এক গ্রাস অন্ন গলাধঃকরণ হইত না, অথবা যাহারা প্রত্যহ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মৎস্য শিকার ভিন্ন জল গ্রহণ করিত না, আজ ঠাকুরের কৃপায় তাহারা নিত্য নিরামিষ হবিষ্যান্নভোজী!! এমন কি আমিষ-স্পৃষ্ট পাত্রে পর্য্যন্ত পান ভোজন করিতে পারিতেছে না! ইহা কি বাঙ্গালীর জীবনে ঠাকুরের অপূর্ব্ব কৃপা নহে? তাই বলিতেছিলাম—এরূপ দেশব্যাপী ভাবে বুঝি আর কেহ বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন নাই? সমস্ত বাঙ্গালা মুল্লুক জুড়িয়া 'বাঙ্গালীর ঠাকুর' বলিয়া এরূপ ভক্তিপ্লুত ঐক্যতান বুঝি আর কখনও বাজিয়া উঠে নাই।

---

* শ্রীযুক্ত মহাদেবানন্দ গিরি ;—পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্‌ জেলা ময়মনসিংহ।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

স্বামীজী মহারাজের উদার ধর্ম্মনীতি।

এক্ষণে ঠাকুরের সাম্প্রদায়িকতার দোষ-লেশ-শূন্য উদার ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। স্বামীজীর শিষ্যগণকে শৈব বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার শিষ্যগণকে সমবেত ভাবে শৈব, শাক্ত কি বৈষ্ণব বলা যায় না। স্বামীজী তাঁহার শিষ্যগণের ভিতর এমন বীজ উপ্ত করিয়া গিয়াছেন, যাহা হইতে প্রত্যেকেই আপন আপন ইষ্ট খুঁজিয়া পাইতেছেন, অথচ সমবেত ভাবে তাঁহারা কোন সম্প্রদায় বিশেষের কুণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন। তাঁহারা সকল সম্প্রদায়কেই কোল দিতে পারেন। স্বামীজীর শিষ্য বহুলতা দর্শনে দেশীয় গুরু সম্প্রদায়ের অনেক কুলগুরু তাঁহার উপর বিশেষ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সকলকেই একান্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং প্রত্যেক পরিবারের কুলগুরুর প্রতি যাহাতে ঐ পরিবারের শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে এবং তাঁহাদের প্রাপ্য বার্ষিক অর্থ যেন নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার শিষ্যগণকে বিশেষ সাবধান করিতেন।

সাধারণতঃ তিনি ৯ মালা জপের যে উপদেশ দিতেন, তাহাতে জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভগবানের যে কোন নাম নিতেই উপদেশ দিতেন। তৎকৃত শ্লোক :—'গৌরী শঙ্কর সীতা রাম, রাধে রাধে শ্যাম শ্যাম' সকল বালক বালিকাকেই মুখস্থ করাইতেন। তাঁহার শিষ্যদের স্তোত্রের ভিতর হরিহর উভয়েরই স্তোত্র আছে। প্রণামে আছে :—যৌ তৌ শঙ্খকপালভূষিতকরৌ মুক্তাস্থি মাল্যধরৌ, দেবৌ দ্বারাবতী শ্মশান নিলয়ৌর্নাগারিগোবাহনৌ দ্বিত্র্যক্ষৌ বলিদক্ষযজ্ঞমথনৌ শ্রীশৈলজাবল্লভৌ, পাপং মে হরতামুভৌ হরিহরৌ শ্রীবৎস গঙ্গাধরৌ॥

তিনি শিষ্যদের গৌরিক দিয়া যে নামাকরণ করিতেন তাহাতে শিবানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, গৌরানন্দ, রামানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় চিহ্নিত নামই আছে। তিনি তাঁহার শিষ্যগণের আন্তরিক ভাব বা আধ্যাত্মিকতা লক্ষ্য করিয়া কাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান উপাসনা করিতে, কাহাকে গৌর ভজন কীর্ত্তন করিতে, কাহাকে শিবার্চ্চন করিতে উপদেশ দিতেন, যাঁহার ভিতর যে মন্ত্রশক্তি নিহিত আছে লক্ষ্য করিতেন, তাহাকে সেই মন্ত্রেই দীক্ষিত করিতেন। (এসব বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে পাওয়া যাইবে)। তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার সেবকগণের কেহ কেহ তাঁহারই ফটোর সহিত, রাধাকৃষ্ণ, গৌরনিতাই প্রভৃতির ফটো রক্ষা করিতেছে, ভোগারতি দিতেছে, উৎসবাদি সম্পন্ন করিতেছে। তিনি যখন যে নগরে বা গ্রামে যাইতেন তথাকার প্রায় প্রত্যেক দেব-মন্দির দর্শনে যাইতেন এবং অধিষ্ঠিত দেবতার (শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা) উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন এবং কিছু প্রণামীও দিতেন। তিনি বলিতেন,

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং
সর্ব্বদেব নমস্কার কেশবং প্রতি গচ্ছতি।

তাঁহার হরিদ্বার আশ্রমে প্রতিদিন মহাদেবের ভোগ ও গঙ্গার ভোগ হইয়া থাকে, প্রতি পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী, সংক্রান্তি, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি উপলক্ষে গঙ্গায় ৫—১০ সের দুধ ঢালা হয়। মহাষ্টমী তিথিতে দুর্গাপূজা, চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীর এক একটী মন্ত্রে আহুতি পূর্ব্বক হোম কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুর গণ্ডী ছাড়িয়া খ্রীষ্টান, মুসলমান, এমন কি বেশ্যাও তাঁহার মন্ত্র শিষ্য ছিল। প্রসিদ্ধ সা সাহেবের সহিত তাঁহার একান্ত সখ্য ছিল। ১৩৩৩ সনের হরিদ্বারের কুম্ভে দেখিয়াছি ইউরোপীয় বড় বড় সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

তাঁহার নিকট আসিত। রাস্তায় ঘোড় সোয়ার চলিতে চলিতে ঠাকুরকে দর্শন মাত্র টুপী খুলিয়া তাঁহাকে সেলাম করিত এবং ঠাকুরের প্রদত্ত এলাচ, বাদামাদি প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ঠাকুরের নিকট হাত বাড়াইয়া দিত। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন ভারতের বড়লাট মহামতি লর্ড রিপণ তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ঠাকুরেরই উপদেশানুসারে ভারতে সর্ব্বপ্রথম স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করেন। তিনি উক্ত লাট সাহেবকে গোমাংসাহার হইতে বিরত করাইয়াছিলেন। (পরবর্ত্তী ঘটনায় দ্রষ্টব্য) তাই আবার বলিতে ইচ্ছা হয় মহাপ্রভুর পর সাম্প্রদায়িকতার কঠোর বন্ধন ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মের নামে একই উচ্চ পতাকার নীচে সকল জাতি ও বর্ণ এতদধিক বিস্তৃতভাবে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে কোল দিবার বুঝি আর কখনও এমন সুযোগ ঘটে নাই। ঠাকুর! আমরা বাঙ্গালী, তোমাকে বাঙ্গালীর ঠাকুর জানিয়া তোমার শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে গড়াগড়ি দিতে গৌরব বোধ করিতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বামীজী মহারাজ সম্বন্ধে মহাপুরুষগণের অভিমত।

যেজন পাঠশালার বাল্যশিক্ষার ছাত্র সে কলেজের এম, এ ক্লাশের অধ্যাপকের কথা কি বুঝিবে? অগাধ জলধির বারি পরিমাপ কার্য্য কি ক্ষুদ্র সফরী দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে? বিশেষতঃ তিনি যে ভাবে সতর্কতার সহিত আত্মগোপন করিয়া চলিতেন, তাহাতে আমার মত ক্ষুদ্র কীটের পক্ষে

ঐ পর্ব্বত গাত্রের পাষাণ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ মণি-রত্নের খনি বাহির করা একেবারেই অসম্ভব। তবে তিনি মাঝে মাঝে ধরা দিতেন। প্রকৃত ভক্তের সহিত আলাপে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই অধিকারী বিচার করিয়া নিক্তির ওজনে উপদেশ দিতেন। যখন পাত্র জুটিত, প্রকৃত অধিকারীর সহিত ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে প্রসঙ্গাদি চলিত, তখন বুঝা যাইত তিনি দুর্ভেদ্য পাষাণ মণ্ডিত এক অতল স্পর্শ "সুধা-সমুদ্র"।

ঠাকুরের হরিদ্বার অবস্থান কালে তথায় যত সাধু সন্ন্যাসী মোহান্ত আসিতেন, প্রায় সকলেই একবার শ্রীঠাকুরের চরণে মাথা নোয়াইয়া যাইতেন। ঠাকুরের ভক্তশিষ্য ভারতের যেখানেই বিচরণ করুক না কেন, স্বামীজী মহারাজের চরণাশ্রিত জানিতে পারিলে সকল আশ্রমের সকল মহাত্মাই তাহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও যত্ন সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। কুম্ভ মেলার সময় সমাগত সমস্ত যতি, ব্রতী, উদাসীন, ঋষি, তপস্বী, যোগী, সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত মহাপুরুষগণ তাঁহাকেই অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিবিধ মণিরত্ন খচিত গাত্রাবরণে সজ্জিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক কুম্ভস্নান করিতেন। জহরী ভিন্ন জহরের বিচার কে করিবে? গঙ্গাজল দিয়াই গঙ্গা পূজা করিতে হয়। অনন্ত আকাশ অনন্ত আকাশেই প্রকাশিত হইয়া থাকে; তাই মহাপুরুষদের বাক্য দ্বারাই ঠাকুরের বর্ণনা শেষ করিব।

স্বামীজী মহারাজের জনৈক শিষ্য ইদিলপুর নিবাসী বাবু কিশোরী-মোহন রায় চৌধুরী তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের দুই বৎসর পূর্ব্বে গুরু অন্বেষণে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া একদিন (১৩২০ সনে) প্রসিদ্ধ মুসলমান ভক্ত সাধক সা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বাবা, আপনি কি ভোলা গিরি বাবাকে চিনেন?

সা সাহেব—আমাদের সকলের সঙ্গেই সকলের জানা শুনা আছে।

কিশোরী বাবু—তিনি কেমন লোক বাবা!

সা সাহেব—খুব বড় লোক, খুব বড় লোক, খুব বড় লোক।

১৩২৯ সনে শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে ঠাকুর চন্দ্রনাথ তীর্থে সীতাকুণ্ড আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সে দিন মহাত্মা মোহন গিরি (আলেক বাবা নামে প্রসিদ্ধ) কতিপয় সাধুসহ স্বামীজী দর্শন করিতে তাঁহার সীতাকুণ্ড আশ্রমে আসিয়াছিলেন, কথা বার্ত্তার পর ঠাকুর আলেক বাবাকে বলিলেন—"মহাদেব দর্শনে যাবেন না?" উত্তরে আলেক বাবা বলিলেন—'আর কাঁহা যাব বাবা! এ যে মহাদেব দর্শনেই আসিয়াছি। ঠাকুর 'চুপ রহ' বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

১৩৩৩ সনের পূর্ণকুম্ভের সময় একদিন ঠাকুর সশিষ্য কনখল দক্ষেশ্বর শিবের বাড়ী চলিয়াছেন, পথে এক সাধুর জমায়েৎ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ আশ্রমের মোহান্তের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইবার পর মোহান্ত বলিলেন—"চলুন, আজ আমাদের হাতিতে উঠাইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া আসি।"

ঠাকুর—আমার ছেলেদিগকে দক্ষেশ্বর পূজা করাইতে হইবে, আমি যেতে পার্‌ব না।

মোহান্ত:—বাবা, তুমিই যে দক্ষেশ্বর, তুমি আবার ইহাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?

ঠাকুর অট্টহাসি হাসিয়া 'চুপচুপ' বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের নিজমুখের একটা কাহিনী ঠাকুর একদিন বলিলেন—"দেখ, বিল্বকেশ্বরে* এক সময় একজন সাধু থাকিতেন। একদিন একটী

---

* হরিদ্বার বিল্বকেশ্বর, এই স্থানেই ঠাকুরের সাধন গুহা এখনও বিদ্যমান আছে।

বাবু বিশেষ এক স্নান উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বাবুটী সাধুকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবুটী সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি যে গঙ্গাস্নানে গেলেন না ?"

সাধু—আমি যে গঙ্গাস্নান করব এমন আমার শক্তি কোথায় ?

বাবুটী এই কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন 'ইনি বলেন কি ?'

ইহার একটু পরেই সাধু বলিলেন :—"বৈস, আমি একটু পরেই আসিতেছি।" এই বলিয়া সাধুটী উঠিয়া গেল। সাধু উঠিয়া যাওয়ার পরেই ঐস্থানে দুইটী গরু উপস্থিত হইল—একটী লাল, একটী কালো। গরু দুটী আসিয়াই সাধু যে স্থানে বসিয়াছিলেন ঐ স্থানের ধূলায় গড়াগড়ি দিল। দেখিতে দেখিতেই গরু দুইটা সাদা হইয়া গেল। এবং তখনই সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। ইহার পরেই সাধু সে স্থানে আসিয়া যথাস্থানে বসিলেন ও বাবুটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সাধু—কি দেখিলেন ?

বাবু—আপনি উঠিয়া যাওয়ার পরেই ঐ স্থানে দুইটী গরু আসিল একটী লাল ও একটী কালো। তাহারা আপনার বসিবার স্থানে গড়াগড়ি দিয়াই উভয়ে সাদা হইয়া চলিয়া গেল। ইহারা কে ?

সাধু—এর উত্তর গরুকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন ?

বাবু—গরু কি কথা বলিতে পারে ?

সাধু—যে গরু রং পরিবর্ত্তন করিতে পারে, সে কথাও বল্‌তে পারে।

বাবুটী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গরু দুইটীর পাছে পাছে দৌড়িয়া গেলেন এবং গরুর নিকট গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমরা কে ?" গাভীদ্বয় বলিলেন, "আমরা গঙ্গা ও যমুনা। আমাদের মধ্যে যাহাকে লাল দেখিয়াছ সে গঙ্গা, এবং যাহাকে কাল দেখিয়াছ সে যমুনা। যত পাপী আমাদের মধ্যে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইয়া যায়,

আমরা তাহাদেরই পাপ গ্রহণ করিয়া থাকি। সে পাপদ্বারাই আমরা বিবর্ণ হইয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ মহাপুরুষের পদরজস্পর্শে নিষ্পাপ হইয়া সাদা হইয়া গেলাম।"

বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের কথার ভাষায় ও ইঙ্গিতে এবং অপরের মুখে শুনিয়া ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে যে ঐ সাধু স্বয়ং স্বামীজী মহারাজই বটেন!

আর একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"আমি একদিন কাশীধামে গঙ্গাস্নান করিতেছিলাম, ঐ সময় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ঐ ঘাটে স্নান করিতেছিলেন। তিনি আমার স্নানের মন্ত্র শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধুজী, এইরূপ মন্ত্র কোন্ শাস্ত্রে আছে?" (ঐ মন্ত্রটীর অর্থ এইরূপ ছিল যে—গঙ্গার মঙ্গলের জন্যই আমি স্নান করিতেছি।) আমি বলিলাম, "ভগীরথ যখন গঙ্গা আনয়ন করেন তখন গঙ্গা ভগীরথকে কি বলিয়াছিলেন? তিনি এই বলিয়াছিলেন যে আমি পৃথিবীতে গেলে সমস্ত লোকের পাপ আমাকে দিয়া যাইবে; আর আমার এই সঞ্চিত পাপ কে নিবে? যদি আমার এই পাপ কেহ গ্রহণ করিতে স্বীকার করে, তবে আমি পৃথিবীতে যাইতে পারি। নচেৎ যাব না।" এই কথা সত্য কি না?

বিদ্যার্ণব—হাঁ! এইরূপ শাস্ত্রে আছে বটে।

ঠাকুর—গঙ্গার পাপ মোচনের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল?

বিদ্যার্ণব– ভগীরথ প্রথমে দেবতাগণের নিকট গেলেন, কিন্তু দেবতাগণ পাপ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরে সাধুদের নিকট গেলে তাঁহারা গঙ্গার পাপ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

ঠাকুর—তবে আমার মন্ত্রটা অশাস্ত্রীয় নয়!

বিদ্যার্ণব—তা বটে।

বিগত ১৩৩৩ সনের কুম্ভের সময় জনৈক উচ্চ যোগশক্তি সম্পন্ন সাধু বলিয়াছিলেন—এইবার এই কুম্ভস্নানে পাঁচজন মাত্র পরমহংস মহাপুরুষ আসিয়াছেন ঃ—তন্মধ্যে স্বামীজী মহারাজ একজন। ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহু সাধু মোহান্ত মণ্ডলেশ্বর আসিয়া ঠাকুরের এই মৃতদেহ পূজা করিয়াছিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"আজ হইতে হরিদ্বারের মাথা বসিয়া গেল।" সর্ব্বশেষ বাঙ্গালীর গৌরব ভক্ত চূড়ামণি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মন্তব্য দ্বারা এই বিষয়ের উপসংহার করিতেছি ঃ—ইদিলপুর মূলগ্রাম নিবাসী ৺ রাসবিহারী গুহ মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের একজন প্রিয় ভক্তশিষ্য ছিলেন। ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একবার স্বামীজী মহারাজকে ইদিলপুর নিয়াছিলেন। ইদিলপুরের এক পূর্ণিমা সম্মিলনীতে ঐ সম্মিলনীর সভ্যগণ এক সময় রাসবিহারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে কি জানেন তাহা তাঁহারা শুনিতে ইচ্ছা করেন। তদুত্তরে রাসবিহারী বাবু সভ্যগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন, "আমি আমার নিজের কথায় স্বামীজী মহারাজ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার গুরুদেব গোসাইজী নিজমুখে স্বামীজী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি ;—গোসাই বলিয়াছেন—"হিমালয়ের নীচে মহাত্মা ভোলাগিরি বাবার মত শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা আর নাই, তিনি এই পৃথিবীর মত পৃথিবী ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারেন এবং গড়িয়া ভাঙ্গিতে পারেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবিধ ঘটনাবলী।

মৃত পুত্রের জীবন সঞ্চার।

বাবু কৈলাশচন্দ্র দাস ঠাকুরের প্রথম বাঙ্গালী শিষ্য। তাঁহার মুখে ঠাকুরের একটা কাহিনী শুনা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বহু পূর্ব্বে (প্রায় ৫০ বৎসর হইবে) কৈলাশ বাবু ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, ঐ সময় একদা ঠাকুর ও কৈলাশ বাবু রাত্রের গাড়ীতে দিল্লী পৌছছিলেন, ঠাকুর গাড়ী হইতে নামিয়াই পদব্রজে শ্যামলাল পণ্ডিতের বাড়ী উপস্থিত হইয়া একেবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার থাকায় কৈলাশ বাবু ঠাকুরের সঙ্গে দ্রুত চলিতে গিয়া সিঁড়িতে আছাড় পড়িয়া গেলেন, তাঁহার বাম পা খানা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সিঁড়িতেই পড়িয়া রহিলেন। ঠাকুর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে নেওয়ার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন, তিনি অনেক কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিলে, ঠাকুর বলিলেন, "উহাকে জল পট্টি দিয়া শোয়াইয়া রাখ"। ঠাকুরের আদেশে তাঁহাকে এক কোঠায় শোয়াইয়া রাখা হইল, ঠাকুর অন্য ঘরে শয়ন করিলেন। রাত্র ৩টার সময় ঠাকুর কৈলাশ বাবুর কোঠায় আসিয়া ডাকিলেন, "কৈলাশ, কৈলাশ, চল্, যমুনা স্নানে চল্।" কৈলাশ বাবু বলিলেন, "বাবা! আমার পা ভাঙ্গিয়াছে,

আমি যাইতে পারিব না।" ঠাকুর বলিলেন, "চল, চল, গাড়ী করে নিব, এখন উঠিয়া আস।" তিনি আর কি করেন, অগত্যা উঠিয়া কোনরূপে গেইটের নিকট গেলেন, যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, গাড়ী কোথায়?" ঠাকুর বলিলেন, "চল, সামনেই গাড়ী আছে, চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়"—বল্‌তে বল্‌তে ঠাকুর তিন মাইল দূরবর্ত্তী যমুনা তীরে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। যমুনা তীরে গিয়া ঠাকুর বলিলেন, "কৈলাশ, তামাসা দেখ্‌বি"? কৈলাশ বাবু বলিলেন, "কি তামাসা বাবা"? ঠাকুর, কৈলাশ বাবুকে একটী "মরা" দেখাইলেন, উহাকে ধাড়ামোড়া দিয়া দাহ করিবার জন্য যমুনা তীরে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে, যমুনার জলে স্নান করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যেমন কলসী জলে শব স্নান করায় সে দেশে জলে নামাইয়া স্নান করায়। ঠাকুর ঐ মৃত দেহটী কৈলাশ বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "কৈলাশ, এ ছেলেটা মরে নাই"। কৈলাশ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "উহাকে দাহ করিবার জন্য ধাড়ামোড়া দিয়া আনিয়াছে, এখনই দাহ করিবে, আপনি বলছেন ঐটী মরে নাই!" ঠাকুর বলিলেন, "একটু দাঁড়া, তামাসা দেখ্‌বি"। এদিকে বাপ কাঁদিতে কাঁদিতে যমুনার জলে স্নান করাইবার জন্য ধাড়া খুলিয়া শবদেহ বাহির করিল, জলে নামাইয়া ডুব দেওয়াইবা মাত্র মৃত দেহ ঝিকি মিকি দিয়া উঠিল। বাপ শিহরিয়া উঠিল, মনে করিল ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। বাপ সহ সব লোক ছেলেটীকে জলে ফেলিয়া ভো-দৌড়! ঠাকুর দৌড়িয়া ছেলের নিকটে গেলেন, জলে ঝাঁপ দিয়া ছেলেটীকে, উঠাইলেন এবং স্বয়ং কোলে করিয়া বসিয়া কৈলাশ বাবুকে বলিলেন, "কৈলাস, এখান হইতে এক মাইল দূরে এক দোকানে এখন হালুয়া ভাজিতেছে, তুই এক দৌড়ে যাবি, এক দৌড়ে আস্‌বি, চারি পয়সার হালুয়া নিয়ে আয়।" কৈলাশ বাবু উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন, ঠিক ঠিক ঐ দোকান হইতে

গরম গরম হালুয়া নিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "কৈলাশ, এখন তুই একে কোলে নিয়া বসিয়া হালুয়া খাওয়া"। কৈলাশ বাবু ছেলেকে কোলে নিয়া হালুয়া খাওয়াইতে লাগিলেন, হঠাৎ তাঁহার পা ভাঙ্গার কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন, "আমার না পা ভাঙ্গিয়াছিল! এখন দেখি তার কিছুই নাই!" রাত্রি প্রভাত হইলে, চতুর্দ্দিকে জনরব উঠিল এক সাধু মরা বাঁচাইয়াছে। দেখিতে দেখিতে যমুনাতীরে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। প্রায় লক্ষাবধি লোক জমায়েৎ হইয়াছে। ছেলের পিতা ক্রমে নিকটে আসিয়া অবশেষে সাধুর নিকট ছেলে দাবি করিয়া বসিল। ঠাকুর বলিলেন, "তোর ছেলেত মরিয়াই গিয়াছে, আমি যমুনার জল হইতে একে কুড়াইয়া লইয়াছি, এ এখন আমার চেলা, আমার চেলা তোমাকে দিব কেন?" এই বলিয়া ঠাকুর ছেলেটীকে কৈলাশ বাবুর কোল হইতে লইয়া স্বয়ং কোলে করিয়া বসিলেন। বাপ বেগতিক দেখিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া এক দরখাস্ত করিল—"আমার ছেলে মরিয়াছিল, এক সাধু তাহাকে বাঁচাইয়াছে, এখন সে সাধু আমাকে ছেলে দিতে চায় না; বলে এ আমার চেলা, অতএব আমার ছেলে দেওয়াইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।" সহর ময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। দরখাস্ত পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ছেলের পিতাসহ যমুনাতীরে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

সাহেব বলিলেন—"সাধু, এ লোকের ছেলে ইহাকে ফিরাইয়া দেও।"

ঠাকুর, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে আছেন?"

সাহেব—আমি এখানের ম্যাজিষ্ট্রেট।

ঠাকুর—আপনি হাকিম, বিচারপতি আছেন? আপনিই বিচার করুন এ ছেলে কে পাবে?

এলোকটীর ছেলে মরিয়াছিল, যমুনার জলে ফেলে দিয়েছিল, আমি উঠাইয়া বাঁচাইয়াছি। এখন এ ছেলে কে পাবে?"

সাহেব—আমরা বিচারক, আমাদের কোন মতামত দেওয়ার অধিকার নাই, আমরা আইনের অধীন, আইন দৃষ্টে বিচার করি। আইনে না থাকিলে নজির দেখিয়া চলি, ইতিপূর্ব্বে কেহ কোন দিন মরা বাঁচায় নাই এবং এরূপ মরা ছেলের ঘটনা নিয়াও কোন দিন মোকদ্দমা হয় নাই কিংবা এতৎ সম্বন্ধে কোন নজিরও নাই ; তবে বর্ত্তমান আইনে যাহা আছে তাহাতে এই দেখি বাপের ছেলে বাপই পাবে। এর চেয়ে আমরা আর কিছু দেখি না।

ঠাকুর—তবে আপনি ইহাকেই ছেলে দিতে অনুরোধ করিতেছেন?

সাহেব—হাঁ, আমি আপনাকে ঐরূপই অনুরোধ করিতেছি।

ঠাকুর—আমি ইহাকে ছেলে দিব না। এলোক তার ছেলেকে জলে ফেলে দিয়েছিল। আমি এর মাকে তার ছেলে দিয়া আসিব। সে ঘরে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে।

সাহেব—তবে আসুন, আমার গাড়ীতে চলুন, আমি সহ ছেলে পৌছছাইয়া দিয়া আসিব।

সাহেব, ঠাকুর, কৈলাশ বাবু ও ছেলেটী গাড়ীতে উঠিল। ছেলের পিতা গাড়ীর পিছনে দাঁড়াইয়া চলিল। গাড়ী গিয়া ঐ বাড়ীতে পৌছছিল, ঠাকুর ছেলেটীকে নিয়া তাহার মায়ের কাছে গেল, মা তখনও অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিল। ঠাকুর যাইয়া "মা" "মা" বলিয়া ডাকিলেন, "কাঁদিস কেন মা, এই নে, তোর ছেলে নে।" এই বলিয়া ছেলেটীকে মায়ের কোলে দিয়া ঠাকুর বাহির হইয়া আসিলেন। লোকের ভিড় আর কমে না দেখিয়া ঐ রাত্রে ঠাকুর কৈলাশ বাবুকে বলিলেন, "কৈলাস, চল, এখানে আর থাকা চলে না। আজকের রাত্রের গাড়ীতেই চড়ে পালাইয়া যাই।" ঐ রাত্রেই তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

স্বামীজী ও লর্ড রিপণ।

ইদিলপুর নিবাসী বাবু কিশোরীমোহন রায় চৌধুরী লর্ড রিপণের সঙ্গে ঠাকুরের যে আলাপ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে জানিবার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—"একবার আমি শিমলা পাহাড়ে বেড়াইতেছি, এমন সময় বড় লাট লর্ড রিপণও ঐ রাস্তায় আসিলেন, সাহেব আমাকে দেখিয়াই মাথার টুপী খুলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেব, তুমি কাহাকে সেলাম করিলে? বস্তু হিসাবে ত তুমি আমি এক।" লর্ড রিপণ বলিলেন, "তোমার আকর্ষণী শক্তিকে সেলাম করিলাম।"

তৎপর উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সাহেব শেষে বলিল, "আপনার সঙ্গে কোন্ সময়, কোন্ স্থানে উভয়ে নিভৃতে আলাপ করিতে পারিব?" পাহাড়ের উপর একটী স্থান মনোনীত করিয়া সাহেবকে বলিলাম, "আগামী কল্য অতটার সময় উভয়ে ঐ স্থানে একত্র মিলিত হইব।" পরদিন ঠিক ঐ সময় উভয়ে একত্রিত হইলাম। সাহেব মাত্র একটী আরদালী সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে বহুদূরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল। বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ আসিলে আরদালীটী সাহেবকে ইসারা করিত; পরে উত্তর নিয়া চলিয়া যাইত। এ ভাবে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া এক মাস কাল পর্য্যন্ত আমার নিকট উপদেশ নিয়াছিল। লর্ড রিপণ এবং ডাক্তার সেণ্ডেল আমার মন্ত্রশিষ্য।"

ঠাকুর যখন এসব কথা বলিতেছিলেন নিকটে ইদিলপুরের ৺রাসবিহারী গুহ মহাশয়ের পুত্র বিনোদবিহারী গুহ তথায় ছিল, তখন সে ছেলে মানুষ; সে ঐ কথা শুনিয়া ঠাকুরকে বলিল, "বাবা, তুমি লর্ড রিপণকে মন্ত্র দিলে কি করে?" সে যে গো-খাদক! ঠাকুর জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, "লর্ড রিপণ কোন মাংসই খাইত না। সে রুটী মাখন খাইত।"

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, তোদের যখন কংগ্রেস জন্মে নাই তখন তোদের স্বায়ত্ত শাসন (Local Self Government) কে দিয়াছিল বলিতে পারিস? তদুত্তরে দাসের জঙ্গলের শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী বলিলেন, "লর্ড রিপণ দিয়াছিলেন।"

ঠাকুর—সে কাহার ইচ্ছায় জানিস্? উহা আমার ইচ্ছায়ই হইয়াছিল।

সা-সাহেব মিলন।

১৩১৯ সনে ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া যখন কুমিল্লা শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন গুহ মুনসেফ বাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধক সা-সাহেব, ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। সা-সাহেব আসিতেছেন শুনিয়া পৃথক একখানা আসন প্রস্তুত করাইলেন এবং নিজে দুই হাতে দুইটী ফল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সা-সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়াই ঠাকুরের পায়ে পড়িতে উদ্যত হইবামাত্র ঠাকুর উঠাইয়া সাহেবের দু'হাতে ফল দুইটী দিলেন এবং কোলাকোলি করিলেন। সা-সাহেব একটী ফল ঠাকুরের চরণে রাখিয়া অপরটী লইয়া নিজ আসনে গিয়া বসিলেন। যখন দুইজনে আলিঙ্গন দিতেছিলেন তখন উভয়ে গদগদ হইয়া কত কি বলিলেন। সা-সাহেব আসনে উপবিষ্ট হইয়া নীরব, ঠাকুরও নিজ আসনে নীরব, ভক্ত-দর্শক সকলেই নীরব। যেন নীরব ভাষায় পরস্পর আলাপ ব্যবহার করিতেছেন, মাঝে মাঝে নীরবতা ভেদ করিয়া সা-সাহেব "জয়গুরু, জয়গুরু" বলিয়া উঠিতেছেন। ঠাকুরও—"ন গুরুরধিকং ন গুরুরধিকং" বলিয়া ধ্বনি করিতেছেন। উভয়ের চক্ষু যেন কোন অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি পড়িয়া আছে। ইতিমধ্যে নীরদ বাবুর অন্তঃপুর

হইতে দুইছড়া মনোরম ফুলের মালা আসিল, ঠাকুর দুই ছড়াই সা-সাহেবকে দিতে আদেশ করিলেন। সা-সাহেব বলিলেন, "না, তা হবে না, আগে গুরুজীর পাদপদ্ম হইতে প্রসাদী করিয়া লও।" ভক্ত সেবক তাহা লইয়া ঠাকুরের পাদপদ্ম স্পর্শ করাইতে উদ্যত হইলে ঠাকুর ফুলের মালা হাতে ধরিয়া স্পর্শ করিয়া দিলেন, তখন ঐ ফুলের মালা সা-সাহেবকে পরাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সা-সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ক্রমে শুইয়া পড়িলেন এবং এ পাশ ও পাশ হইতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিলেন। এভাবে অনুমান ৩ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। অতঃপর সা-সাহেব গাড়ীতে উঠিয়া স-শিষ্য প্রস্থান করিলেন।

"ভকিলকে ডাক"।

ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী রূপবাবুর পৌত্র বাবু যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় ঠাকুরের কৃপাশ্রিত ব্যক্তি। একদিন তাঁহার প্রাঙ্গন হইতে স্বামিবাগ ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীর আশ্রমে ঠাকুরের যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়। ছোট, বড় শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বহু লোক প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়াছেন। দুইখানা ঘোড়ার গাড়ী ও একখানা মটর প্রস্তুত ছিল, ঠাকুরের সঙ্গীয় ২।৪ জন ব্যতীত আর সকলে হাটিয়া চলিল। এই জন বহুলতা হইতে একটু দূরে লেখক দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, আহা! মটরেত কোন দিন উঠি নাই। (তখন সবে মাত্র মটর এদেশে আসিয়াছে)। যদি এ সময় একটু মটরে উঠিতে পারিতাম! এই কথা মনে মনে ভাবিতেছি, ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই এই জন কোলাহল ভেদ করিয়া একটী স্বর আমার কাণে পৌছছিল।

"ভকিলকে ডাক"। (ঠাকুর আমাকে ভকিল বলিয়া ডাকিতেন)। ঐ স্বরের সঙ্গে আমার একজন বন্ধু গুরু-ভাই দৌড়িয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিলেন, "ঠাকুর আপনাকে ডাকিতেছেন।" ঠাকুর ইতিমধ্যে মটরে উঠিয়া বসিয়াছেন, আমি মটরের নিকট উপস্থিত হইতেই বলিলেন, "ভকিল, মটরে উঠ্ যাও" মটরে স্থান সঙ্কুলন না হওয়াতে অন্য একজনকে মটর হইতে নামাইয়া আমার স্থান করা হইল। আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া গেলাম। এত লোকে লোকারণ্য, আমা অপেক্ষা বহু ধনী, মানী, জ্ঞানী, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত লোক উপস্থিত, ঠাকুর কাহাকেও না ডাকিয়া দূর হইতে আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন, বিশেষতঃ যেই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণে মটর চড়ার সাধ জন্মিল, সেই মুহূর্ত্তেই ডাক। আনন্দে, উৎসাহে, বিস্ময়ে, উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া স্মিত বদনে মটরে চাপিয়া বসিলাম, আর ঠাকুরের অন্তর্য্যামীত্বের কথা ভাবিয়া মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণের সাথী হইলাম।

ফকিরকে দর্শন দান।

কুমিল্লা নীরদবাবুর বাসায় ঠাকুর একদিন বেলা অনুমান ৯টার সময় ভিতর বাড়ীতে দীক্ষা ঘরে দীক্ষা দিতেছেন, এমন সময় একজন মুসলমান ফকির একটী বীণা যন্ত্র হস্তে করিয়া বাহির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এবং বাহির বাটীতে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের নিকট ঠাকুর দর্শনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা ফকিরকে জানাইলেন যে ঠাকুর ভিতর বাড়ীতে দীক্ষা দিতেছেন, ১২টার মধ্যে দেখা হবে না। ফকির কিছু না বলিয়া বীণা-হস্তে বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর যখন দীক্ষা দেন

তখন দীক্ষার কার্য্য সমাধা না করিয়া কোন দিনও ঘরের বাহির হন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে দিন দীক্ষা কার্য্য সমাধা না হইতেই ঠাকুর হঠাৎ দীক্ষা গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে বাহির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ফকিরটী ঠাকুরের দর্শনমাত্র দৌড়িয়া আসিল এবং বীণা হস্তে ঠাকুরের শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। ঠাকুর যে ফকিরকে দর্শন দিবার জন্যই এভাবে হঠাৎ দীক্ষা গৃহ হইতে বাহির বাটীতে আসিয়াছেন এভাব গোপন রাখিবার জন্য ঐস্থানে অপরের সহিত কথা কহিবার ছলে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পরে ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিয়া পুনরায় দীক্ষা কার্য্যে গেলেন।

"বীজ ফিরায়ে দে"।

১৩১৯ সনে ঠাকুর যখন পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন তখন মহাপুরুষ বাণীর লিখক বাবু হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের ভগ্নী ও ত্রিপুরা জিলান্তর্গত বাত্তিসা গ্রাম নিবাসী মৃত বসন্তকুমার সেন গুপ্তের বিধবা পত্নী পঙ্কজিনী দেবী তাঁহার নিকট দীক্ষা নিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু পূর্ব্বে কুলগুরু হইতে দীক্ষা নেওয়ায় পুনঃ দীক্ষা নেওয়া সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ কুলগুরু হইতে দীক্ষা নেওয়ার কথা ঠাকুর জানিলে তাঁহাকে পুনঃ দীক্ষা দিবেন কিনা সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব দীক্ষার কথা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিনে দীক্ষার জন্য ঠাকুরের নিকট উপবেশন করিয়াছেন, ঠাকুর প্রথমেই তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, কুলগুরুরূপে তোকে যে বীজ দিয়া আসিয়াছি তাহা আমাকে এখন ফিরাইয়া দে",

পঙ্কজিনী দেবী একথা শুনিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। তিনি সন্দেহ ও ভয়ের যে গুরুভার বহন করিতেছিলেন ঠাকুর মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা হাল্‌কা করিয়া দিলেন। পূর্ব্ব দীক্ষার কথা গোপন রাখিয়া ঠাকুরের সহিত যে লুকোচুরি খেলিতেছিলেন ঠাকুর হাসিতে হাসিতে তাহা ধরিয়া দিলেন। পূর্ব্ব দীক্ষা মন্ত্র থাকিতে পুনঃ দীক্ষা হওয়ার সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে একটু খট্‌কা ছিল, পূর্ব্ব দীক্ষা মন্ত্র ফিরাইয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া তাহাও পরিষ্কার হইয়া গেল। ঠাকুরের নির্দ্দেশ মতে পূর্ব্ব দীক্ষা মন্ত্র বিল্বপত্রে লিখিয়া ঠাকুরের চরণে অর্পণ করতঃ তিনি সানন্দে ঠাকুরের কৃপা লাভ করিলেন।

মাইর পাক খাব

ঠাকুর কুমিল্লার মুন্‌সেফ বাবু নীরদরঞ্জন গুহ মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করিতেছেন, একদিন তথাকার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু তারাপ্রসন্ন আচার্য্য ঠাকুরকে তাঁহার বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ঠাকুর স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আগামী কল্য প্রাতে আমার পাচক গীতাকে নিয়া যাইও, সে-ই পাক করিবে"। তারাপ্রসন্ন বাবু বাসায় গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "স্বামীজী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তোমার পাক খাবেন না, তাঁহার নিয়ত পাচক আসিয়া পাক করিবে।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, বলিতেছেন, "আমি যে কত পাপ করিয়াছি তাহার ফলে ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়াও একজন মহাপুরুষের পাতে দুইটা অন্ন দিতে পারিলাম না।" তিনি সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন। ভক্তের ক্রন্দন ঠাকুরের নিকট

পৌঁছিল, রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় ঠাকুর একজন লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এই মুহূর্ত্তে তারাপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে দৌড়িয়া যাও এবং মাইকে বলিয়া আস, মা পাক করিবেন, আমি মাইর পাক খা'ব।" লোকটী দৌড়িয়া গিয়া তারাপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রীকে এ খবর দিলেন, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পাক-গৃহে প্রবেশ করিলেন, ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ হইল।

পিণ্ড দেওয়া।

ঠাকুর যখন ১৩১৯ সনে সীতাকুণ্ড গিয়াছিলেন তখন তিনি একদিন কিশোরী বাবুকে বলিলেন, "দেখ এখানে পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিতে হয়।" কিশোরী বাবু বলিলেন, "বাবা" আমি কিছুদিন পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যে আমি পিণ্ড দিতেছি আর ঐ পিণ্ড তোমার পায় আসিয়া পড়িতেছে; আমি তোমার পায় পিণ্ড দিতে চাই। ঠাকুর বলিলেন, "নারে-না, সামাজিক বিধানমতে কার্য্য কর। তা হলেই আমার পায় পিণ্ড পড়িবেক।"

একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, গয়াতে পিণ্ড দিলে পুনঃ সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধের কোন প্রয়োজন আছে কি? তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "গয়াতে পিণ্ড দিলে যে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না এমন বিধান শাস্ত্রে নাই। কিন্তু গয়াতে পিণ্ড দেওয়ার পর পিতৃপিণ্ড ব্রহ্মকবাটীতে (বদরিকাশ্রমে) এবং মাতৃ-পিণ্ড গোদাবরীতে দিলে আর বার্ষিক শ্রাদ্ধের প্রয়োজন থাকে না।

মহাদেব ও শিব এক কি না ?

প্র :—বাবা ! মহাদেব যদি ব্রহ্মই হন তবে তাঁহার বিবাহ হইল কিরূপে ? আর তিনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করিলেন, এসব কি ?

ঠাকুর :—শিব আর মহাদেব এক করিও না। শিব অর্থ মঙ্গলময়, অমূর্ত্ত ব্রহ্ম। আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহাদেব ইহারা সত্যযুগের আচার্য্য ! শাস্ত্রে আচার্য্য-উপাসনার ব্যবস্থা আছে।

ফাঁসির আসামীর জীবন লাভ।

ঐ সনে ঠাকুর সীতাকুণ্ড হইতে কুমিল্লা হইয়া স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আহ্বানে আগরতলা গিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালে আগরতলার জেইলার শ্রীযুক্ত মুক্তিদা কুমার বসু মহাশয়ের বাসায় একদিন ঠাকুরের ভোগ হয়। ঠাকুর মুক্তিদা বাবুকে বলিলেন, "আমি তোদের জেল দেখিতে চাই, দেখা'তে পারিস্" ! মুক্তিদা বাবু জেল সুপারিণ্টেডেণ্ট মহোদয়ের আদেশ লইয়া ঠাকুরকে জেল দেখাইতে লইয়া যান। সকলেই ভাবছে ঠাকুর জেল দেখার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করছেন কেন ? ইতিপূর্ব্বে এক খুনের মোকদ্দমায় একটী মুসলমানের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। ঠাকুর যখন আগরতলায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন ঐ ফাঁসির হুকুমে মহারাজের মঞ্জুরীর প্রতীক্ষায় লোকটী জেলে আবদ্ধ ছিল, এ বিষয় ঠাকুরকে কেহই কিছু বলে নাই কিংবা ঠাকুরের সঙ্গীয় কেহই তাহা অবগত ছিলেন না। মুক্তিদা বাবু ও অন্যান্য ভক্তগণসহ, ঠাকুর জেল গেইটে উপস্থিত হইলেন।

গেইট খুলিয়া দেওয়া হইল, মুক্তিদা বাবু বা অন্য কাহাকেও (অন্য কোন জেল অফিসার তখন উপস্থিত ছিলেন না (কিছু না বলিয়া ঠাকুর সরাসরি নিজেই অগ্রসর হইয়া জেল গেইট হইতে বহুদূরে অবস্থিত যে সেলে ঐ ফাঁসির আসামী আবদ্ধ আছে ঠিক সেই সেলের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। লোকটী নানাভাবে ঠাকুরের নিকট কাতরোক্তি করিতে লাগিল। ঠাকুর একটু পরে লোকটাকে বলিলেন, "যেসা কাম কিয়া তে'সা সাজা মিলেগা।" এই বলিয়া ঠাকুর বাহির হইয়া আসিলেন, সকলেই ভাবিল আসামীটীর প্রতি ঠাকুরের কৃপা হইয়াছে। ঠাকুর দর্শন ফলে সে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিবে। বাস্তবিক ঐ ঘটনার সপ্তাহ মধ্যে মহারাজের হুকুম আসিল, লোকটী ফাঁসি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর জানা গিয়াছে লোকটী বাস্তবিক খুন করে নাই। তবে তাহার জানা মতে খুনটী হইয়াছিল বটে। সেও নিজে সরলভাবে ইহা স্বীকারোক্তি করিয়াছে, ঐ লোকটী এখনও জীবিত থাকিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে।

কিশোরী বাবুর দীক্ষা।

ইদিলপুর বেজনীসার গ্রাম নিবাসী বাবু কিশোরীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার দীক্ষা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিতরূপ বিবরণ দিয়াছেন—

১৩২০ সনে ঠাকুর কলিকাতা থাকা কালিন এক চাকুরীর চেষ্টায় আমি কলিকাতা যাই; তখন ২১১নং হ্যারিসন রোডে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করি। সেই দিন মৎস্য খাওয়া সম্বন্ধে ঠাকুরের সহিত তর্ক বিতর্ক

করিয়া চলিয়া আসি। আমার সঙ্গে দেহেরগতি নিবাসী শ্রীমান্ দুর্গানারায়ণ বসুও ছিলেন। আমরা চলিয়া আসার সময় ঠাকুর আমাদিগকে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত একখানা সদাচার পত্র দিলেন এবং বলিলেন,—"সামান্য চাকুরীর জন্য এতদূর আসিয়াছিস, "তাঁর" চাকুরীর জন্য কোথাও গিয়াছিস্?" একটী "নাম" দিয়া বলিলেন, "ইহা শয্যাত্যাগের সময় রেচকে ৩০ বার জপ করিয়া উঠিস।" আমি এসব কথা গ্রাহ্যই করিলাম না। বাড়ী আসিলাম, তাহার ১৪।১৫ দিন পরে ষ্টীমার যোগে ঢাকা রওনা হইলাম। ষ্টীমারে একা বসিয়া আছি, হঠাৎ পকেটে হাত পড়াতে সদাচার পত্রখানা হাতে উঠিল। পড়িতে চেষ্টা করিলাম, দেবনাগর অক্ষর পড়িতে কষ্ট হইল। নারায়ণগঞ্জ আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল, আমিও মনোযোগের সহিত সদাচার পত্র পুনঃ পড়িতেছি। এই সময় আমার প্রতি প্রথম গুরুকৃপা আসিল। আমি তন্ময় হইয়া সদাচার খানা পড়িতেছি, হঠাৎ দেখি গাড়ী ঢাকা ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে। আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। আমার প্রতি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা আসিল, আমি পরের দিন বৈকালে ঢাকা স্বামীবাগে মহাত্মা ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীকে দেখিতে গেলাম, ক্রমে আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তৎপরদিন মুসুরীখোলার সা-সাহেবকে দেখিতে গেলাম। সা-সাহেব খুব বৃদ্ধ, আমি যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, সা-সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছেন?" আমি বলিলাম, "আমার চুল পাকিয়াছে, দাঁতও পড়িতেছে; তবুও দীক্ষা হয় নাই; গুরু চিনার উপায় কি? ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি। হিন্দু সাধুদের নিকট গেলে যেন স্বার্থের গন্ধ পাই, আপনি মুসলমান। আমার নিকট আপনার কোন স্বার্থের আশা নাই। তাই আপনার নিকট

আসিয়াছি। সা-সাহেব বলিলেন, "বাবা" হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম ধর্ম্মই ধর্ম্ম। বিশেষণ বাদ দিয়া ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মে যাহা মিলে তাহাই ধর্ম্ম। কোন ধর্ম্মেই চুরি করিতে বলে না। মিথ্যা কথা বলিতে বলে না। এরূপ যাহা সকল ধর্ম্মে একমত তাহাই ধর্ম্ম। কাল গরুর দুধ, লাল গরুর দুধ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে দোহন করিয়া আনিলে তুমি কি চিনিতে পার কোন্ পাত্রে কোন্ গরুর দুধ রহিয়াছে? সব দুধই এক দুধ, সেইরূপ সব ধর্ম্মই এক ধর্ম্ম।

আমি—বাবা! গুরু চিনিব কিরূপে?

সা-সাহেব—আপনিই চিনিতে পারিবে। যখন মায়ের পেট হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখনই তাহার মুখে একটু কুইনাইন দেও, সে মুখ বিকৃত করিবে, একটু মধু দেও—চোঁ চোঁ করিয়া খাইতে থাকিবে। এই শিশুকে তিতা মিঠা কে চিনাইল? বাবা, আমি আশীর্ব্বাদ করি শীঘ্রই তোমার গুরু মিলিয়া যাইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা! আপনি কি ভোলাগিরি স্বামীজীকে চিনেন?

সা-সাহেব—আমাদের সকলের সঙ্গেই সকলের জানাশুনা আছে।

আমি—তিনি কেমন লোক?

সা-সাহেব—তিনি খুব বড় লোক, খুব বড় লোক, খুব বড় লোক।

বাবা, আমি আশীর্ব্বাদ করি শীঘ্রই তোমার গুরু মিলিয়া যাইবে।" ইহার প্রায় ২ বৎসর পরে একদিন রাত্রে (১৩২২ সনে) আমার বাড়ীর পশ্চিমের ভিটার ঘরে পূবের বারেন্দায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছি, স্বপ্নে দেখিলাম পূর্ব্বদিকের বেড়ায় একটী সূর্য্য উদিত হইয়াছে; তাহা কোটী সূর্য্যের তেজ হইতেও উজ্জ্বল, কিন্তু চন্দ্র কিরণ হইতে স্নিগ্ধ-সুশীতল। আমার চক্ষু বিস্ফারিত; প্রতি রোমকূপ এক একটী মান্দার কাঁটার ন্যায় পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম ঐ সূর্য্যের মধ্যে অসুর ও

সিংহের উপর একখানা "মুখ"। ইহার চতুর্দ্দিকে (কিছু নিম্নে) বসিয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সর্ব্বজাতির লোক একত্র হইয়া কীর্ত্তন করিতেছে। তন্মধ্যে আমিও একজন। এই স্বপ্ন দেখার ১৪।১৫ দিন পরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধুকে আনার জন্য নলমুড়ী ষ্টীমার ষ্টেশনে যাই ; সেইদিন তাহার বরিশাল হইতে আসার কথা ছিল কিন্তু বধু আসিল না। আমি ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছি হঠাৎ আমার মনে একটা কথা আপনা আপনি জাগিয়া উঠিল—অদ্যকার ডাউন ষ্টীমারে ভোলাগিরি স্বামীজী আসিবেন। আমি কিন্তু তাঁহার আসা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। একথা আমার মনে উঠার উপর নির্ভর করিয়াই আমি যেন আবিষ্ট হইয়া ষ্টেশনে দিবা ২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম ; যখন ষ্টীমার ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, দেখিলাম প্রথম শ্রেণীর সম্মুখে রেলিং ধরিয়া একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার গায়ে ফ্লানেলের কোট, মাথায় শিল্কের পাগড়ী। আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুরকে কলিকাতা কৌপীনধারী দেখিয়াছিলাম, অদ্য নূতন ভূষণে ভূষিত দেখিয়া হঠাৎ চিনিতে পারিলাম না। ষ্টীমারে উঠিয়া নানা জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ভোলাগিরি বাবা ঐ ষ্টীমারে আসিয়াছেন কিনা? কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। একটু পরে আমাদেরই বাড়ীর রসিকচন্দ্র বসুকে ষ্টীমার হইতে নামিতে দেখিলাম। তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রসিক, এই ষ্টীমারে কি ভোলাগিরি বাবা আসিয়াছেন?" রসিক বলিল, "হা! চাঁদপুর হইতে তিনি আমি একত্রেই উঠিয়াছি।" আমি এতক্ষণ তাঁহার নিকটই বসিয়াছিলাম, আমি প্রণাম করিয়া নামিয়া আসিবার সময় তিনি বলিয়া দিলেন, 'পাড়ে একটী লোক আমাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে বলিও যে আমি ফাষ্ট ক্লাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি।' আমি রসিকের

নিকট হইতে তাড়াতাড়ি টাকা হাওলাত লইয়া খালি গায়ে, খালি পায়েই ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িলাম। এবং ঠাকুরের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া গেলাম। আমি প্রণাম করিয়া উঠিয়াই তথায় ঠাকুরকে নামাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু নানা ঠেকা প্রযুক্ত ঠাকুরের সে স্থানে নামা হইল না। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। আমি ফাষ্ট ক্লাসে ঠাকুরের নিকট বসিয়া আমার সেই স্বপ্ন বিবরণ বলিলাম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাগ্রত অবস্থায় দেখিয়াছিলে, না ঘুমে ছিলে?" আমি বলিলাম নিদ্রায়ই ছিলাম। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গের পরও জ্যোতিঃ ছিল। আমি উঠিয়া বাহিরে গেলাম। তৎপর আসিয়া শুইলাম। তখনও আলো ছিল। তৎপর অনেকক্ষণ পরে ক্রমে জ্যোতিঃ মিলাইয়া গেল।" ঠাকুর চুপ করিয়া শুনিলেন আর কিছুই বলিলেন না। ঐ সঙ্গে হেমবাবু ছিলেন, তাহার নিকট হইতে একখানা 'মহাপুরুষবাণী' কিনিয়া আনিলাম। অতঃপর হাটুরিয়া ষ্টেশনে নামিয়া হাটিয়া বেজনিসার রওনা হইলাম। রাস্তায় পথ চলিতে চলিতে মহাপুরুষবাণীতে ঠাকুরের ফটোটী দেখিতেই, হঠাৎ মনে পড়িল এইত সে আমার স্বপ্নদৃষ্ট মুখখানি। তখনই স্থির করিলাম ইঁহা হইতে দীক্ষা নিব। বাড়ী গিয়া রাসবিহারী বাবুকে * ঠাকুরের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া ঠাকুরকে নেওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি স্বামীজী মহারাজ আমার বাড়ীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে আনিব না।" পরদিন আমি বরিশাল চলিয়া গেলাম; ঠাকুরকে প্রণাম করিতে ঠাকুর বলিলেন, "কি-রে—আসিয়াছিস্? বধূকে আনিয়াছিস্?"

আমি বলিলাম—না, সে আসিবে কেন?

* ইদিলপুর মুলগ্রাম নিবাসী রাসবিহারী গুহ। ইনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একজন শিষ্য।

ঠাকুর—তোর দীক্ষা হবে, বধূর দীক্ষা হবে না ?

আমি—আমার দীক্ষা হবে কে বলিল ?

ঠাকুর—রাসবিহারী কি আমাকে নিতে পাঠাইয়াছে ?

আমি—না।

ঠাকুর—কেন ?

আমি—রাসবিহারী বাবু স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে আপনি তাঁহার বাড়ীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি আপনাকে নিতে চান না।

ঠাকুর—কি—রে—এত সকাল সকালই কি হইয়া যাইবে? যদি তা-ই হয় তবে তোদের দেশ যে জগন্নাথক্ষেত্র হ'য়ে যাবে।

পর দিবস রাসবিহারী বাবু ঠাকুরকে নেওয়ার জন্য অনুমতি চাহিয়া টেলিগ্রাম করিলেন এবং সন্ধ্যা সময় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে ইদিলপুর নেওয়ার জন্য বরিশাল পৌছিলেন। ১৩১২ সনের ৪ঠা পৌষ ঠাকুরকে লইয়া ৺রাসবিহারী বাবুর বাড়ী পৌছিলাম। রাসবিহারী বাবুর বাড়ী পৌছিয়াই ঠাকুর আমাকে বলিলেন, "তোর স্ত্রীকে আন, তোদের একত্রে দীক্ষা হবে!

আমি—আমার স্ত্রী এখানে আসিবে না। এ যে আমার জামাই বাড়ী।

ঠাকুর—তোমার নাতি হয় নাই ?

আমি—না।

অন্য এক ব্যক্তি—বাবা, তবেত আপনিই ঠেকিলেন।

ঠাকুর—আমি কি করিব? আমি যে রাসবিহারীর কেনা গরু।

আমি রাসবিহারী বাবুকে ঠাকুরের নিকট আনিলাম। রাসবিহারী বাবু বলিলেন,—"বাবা, তুমি যেখানে যাইয়া সুখী হও তাতেই আমার সুখ।" কিশোরীর বাড়ী যাইতে আমার কোনই আপত্তি নাই। আপনি যাবেন,

পরদিন ৫ই পৌষ—পূর্ণিমা প্রতিপদের সন্ধিক্ষণে আমার নিজ বাড়াতে নিজ ঘরে বসিয়া আমাকে সস্ত্রীক দীক্ষা দিলেন। সা-সাহেবের আশীর্ব্বাদ এভাবে, পূর্ণ হইল।

পরদিবস ৬ই পৌষ রাজা রাজবল্লভের বংশধর ৺জগচ্চন্দ্র সেন মহাশয় ঠাকুরকে নেওয়ার জন্য পাল্কী পাঠাইলেন। ঠাকুর রওনা হইবেন, এমন সময় ঢাকিসার নিবাসী রাজকুমার ধুপী ঠাকুরের পায়ে গিয়া পড়িল। ঠাকুর রাসবিহারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাসবিহারী, এ কি চায়?"

রাসবিহারী—বাবা! এ বেদনায় ভারী কষ্ট পাইতেছে। তোমার কৃপা চায়।

ভক্তের অনুরোধ জানিয়া ঠাকুর তাহাকে একটী আমলকি প্রসাদ দিলেন। রাজকুমার, ঠাকুরের প্রদত্ত ঐ আমলকি প্রসাদ মুখে দিয়া চলিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই রাজকুমারের বহু দিনের ব্যারাম চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল।

যে রাজকুমার ভয়ানক বেদনায় ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিল, আজ সে দৃঢ়কায়—স্বাস্থ্যবান্ বিরাট পুরুষ।

প্রাক্তন ও পুরুষকারের মিলন চাই।

১৩২২ বাং সনে ঠাকুর লামচর আসিয়াছেন। লামচরবাসী লক্ষ্মীপুরের খ্যাতনামা উকীল বাবু রজনীকুমার চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করতঃ নিকটে উপবেশন করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—দেখ, সাধু দর্শনে খালি হাতে আসিতে নাই। অন্ততঃ কিছু ফল ফুল সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়।

রজনীবাবু—আপনি কি সাধু?

ঠাকুর—হাঁ, আমি সাধু।

রজনীবাবু—আমি সাধু টাধু মানি না।

ঠাকুর—তবে আসিয়াছিস কেন?

রজনীবাবু—আপনি একজন ভদ্রলোক, গ্রামে আসিয়াছেন, তাই দেখা কর্‌তে আসিয়াছি।

ঠাকুর—তুই সন্ধ্যা আহ্নিক করিস্?

রজনীবাবু—না, আমি সন্ধ্যা আহ্নিক কিছুই করি না। ওতে আমার কোনই বিশ্বাস নাই। সন্ধ্যা আহ্নিকের কি কোন প্রয়োজন আছে? মানুষ কি তাহার কৃত কর্ম্ম দ্বারা তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে? জীবের কি স্বাধীনতা :

ঠাকুর—হাঁ, নিশ্চয়ই আছে। গত জন্মের কর্ম্মফল দ্বারা বর্ত্তমান জন্মের সুখ দুঃখ প্রস্তুত হইয়াছে, আবার এই জন্মের কৃত-কর্ম্মের দ্বারা আগামী জন্মের সুখ দুঃখ তৈয়ারী হইবে।

রজনীবাবু—তা হলে আমরা কর্ম্মেরই অধীন।

ঠাকুর—বর্ত্তমান জন্ম পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের অধীন। কিন্তু বর্ত্তমান জন্মের আত্মকর্ম্ম বা পুরুষকার দ্বারা সেই কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

দেখ, এক বাগানে এক অন্ধ ও এক খোঁড়া চাকর ছিল। একদিন তাহাদের ইচ্ছা হইল বাগানের ফল চুরি করিয়া খায়। কিন্তু কেহই একা কিছু করিতে পারে না। অন্ধ চলিতে পারে, কিন্তু পথ দেখে না, খোঁড়া পথ দেখে, কিন্তু চলিতে পারে না। তখন উভয়ে একত্র হইয়া যুক্তি কর্‌লি,—খোঁড়া অন্ধের কাঁধে উঠিল, অন্ধ চলিতে লাগিল। খোঁড়া পথ চিনাইয়া নিয়া উভয়ে প্রচুর ফল পাড়িয়া খাইল। এরূপ প্রাক্তন ও পুরুষকার একত্র হইলেই কার্য্য সমাধা হয়।

রজনীবাবু—বহুপূর্ব্বে আপনি যখন কলিকাতা এসেছিলেন, তখন আপনাকে দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু যাই যাই করিয়া আর যাই নাই। কিন্তু যে দিন গেলাম সেদিন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আপনি তখন কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর—হাঁ তাই বটে। সেদিন তোর প্রাক্তন ও পুরুষকার একত্র হয় নাই। তাই দেখা হয় নাই। আজ একত্র হয়েছে, তাই দেখা হ'ল।

জীবের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ঠাকুর লামচর বসিয়া যাহা বলিলেন তাহা রজনীবাবুর মনঃপূত হইল না। তিনি সন্দেহের গুরুভার বহন করিয়া তাঁহার কার্য্যস্থল লক্ষ্মীপুর চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর কয়েক দিন লামচর অবস্থানের পর দালাল বাজার হইয়া লক্ষ্মীপুর গেলেন। কালী বাড়ীর সম্মুখে বরোয়ারীর আট চালায় সর্ব্ব-সাধারণের দর্শনের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বহুলোক সমবেত হইয়াছে। রজনীবাবুও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তথায় গিয়াছেন ; যাইয়াই শুনেন তাঁহার লামচরের আলোচিত সেই জীবের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ চলিতেছে। শুনিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল। ঠাকুর বলিতেছেন—জীবের স্বাধীনতা আছেও বটে, নাইও বটে ; উভয়ই সত্য। যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে নিজ ষ্টেটের ম্যানেজার করিয়া তাঁহার হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিতে পারিয়াছে তাহার পক্ষে জীবের স্বাধীনতা নাই। কিন্তু যে ভগবান্‌কে তদ্রূপ ম্যানেজার করিয়া দিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে জীবের স্বাধীনতা আছে।

এই উত্তর শুনিয়া রজনীবাবুর পূর্ব্ব সন্দেহ কাটিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল এই উত্তরটী যেন ঠিক তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যিনি দিয়াছেন—তিনি নিয়াছেন।

বাবু মুরারীমোহন চক্রবর্ত্তী লক্ষ্মীপুরের একজন নকলনবিশ। তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে একান্ত কাতর হইয়া ঠাকুরের নিকট কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বাবা, এক ফোঁটা বীর্য্যের জন্য এত দুঃখ কেন? কত বীর্য্য বৃথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটী পুত্র—এক ফোঁটা বীর্য্য বই ত নয়। ছেলে জন্মাইবার ক্ষমতা কি তোমার আছে? যদি থাকে তবে আরও দশটী জন্মাইয়া নেও, আর যদি না থাকে মনে কর তবে তোমার ইচ্ছায় ছেলে আসেও নাই, তোমার ইচ্ছায় চলিয়াও যায় নাই। যিনি দিয়াছেন, তিনিই নিয়াছেন; বাছা—বৃথা দুঃখ করিয়া ফল কি?

কাউট্টা কম্বল কাঁহা।

নোয়াখালী দত্তপাড়া মোহনগঞ্জ আশ্রমের মোহান্ত সাধু চন্দ্রকুমার ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে ঠাকুর লক্ষ্মীপুর হইতে তথায় যাওয়া স্থির করিয়াছেন, ঐ আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী লামচর হইতে ঐ আশ্রম-টোলের একটী ছাত্র দ্বারা সাধুজীকে এই বলিয়া খবর পাঠান যে, স্বামীজী যখন আশ্রমে আসিবেন তাঁহার উপবেশনের জন্য যেন চৌকীর উপর গালিচা বিছাইবার ব্যবস্থা করেন এবং গালিচা আনাইয়া রাখেন। ছাত্রটী সাধুজীকে ঐ কথা বলিলে সাধুজী বলিয়া ফেলিলেন, "ফকিরের আস্তানে ফকির আস্‌বে, তা আবার গালিচা কেন? আমার সম্বল কাউট্টা (ছেঁড়া) কম্বল, আমি তাই বিছাইয়া দিব।" ঐ রাত্রে যখন সাধুজী নিজ ভজন কার্য্যে বসিয়াছেন, তখন হঠাৎ প্রত্যক্ষ দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার আশ্রমে

আসিয়া তাঁহাকে কোল দিয়া বলিতেছেন, "কিরে, ফকিরের আস্তানমে ত ফকির আয়া, তোর কাউট্টা কম্বল কাঁহা।" যে ছেলেটী ব্রহ্মচারী হইতে ঐ খবর লইয়া আসিয়াছিল, সে সে দিন আশ্রমেই ছিল। আর কোথাও যায় নাই। পর দিন প্রাতঃকালেই ঠাকুরের আশ্রমে পৌঁছছার কথা। স্থানীয় ভদ্রলোকগণ প্রাতঃকালে খোল করতাল ও পাল্কীসহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দক্ষিণ দিকে রাস্তার পথে অগ্রসর হইতেছেন, ঐ পথেই ঠাকুর হাতিতে আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি হাতিতে আসেন নাই, নৌকায় আসিয়া কতক দূর হইতে হাটিয়াই সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর দিক দিয়া একেবারে ফকিরের মত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সাধুজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিরে ফকিরকো আস্তানমে ত ফকির আয়া, তোর কাউট্টা কম্বল কাঁহা ?" সাধুজীও হাসিতে হাসিতে তাঁহার ছেঁড়া কম্বল চৌকীর উপর বিছাইয়া দিলেন, ঠাকুর তাহাতেই উপবেশন করিলেন।

মৃতা স্ত্রীর সহিত সস্ত্রীক দীক্ষা।

১৩২২ সনে ঠাকুর যখন বরিশাল গিয়াছিলেন তখন একদিন চান্দসী নিবাসী বরিশাল বারের উকীল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মজুমদার মহাশয় ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিয়া আছেন, কিছুক্ষণ পরে রমেশবাবু বলিলেন, "বাবা আমি তোমার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী।

ঠাকুর—হবে।

রমেশবাবু—ওই হবেতে হবে না। আমি আমার মৃতা স্ত্রীর সহিত সস্ত্রীক দীক্ষা চাই। এ পর্য্যন্ত আমার মন্ত্রে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তোমাকে দেখিয়াই আমার দীক্ষা নিতে ইচ্ছা হ'য়েছে, কিন্তু আমি সস্ত্রীক দীক্ষা চাই।

ঠাকুর—তুই আর সাদী করিবি না ত?

রমেশবাবু—না, নিশ্চয়ই না।

ঠাকুর—কা'ল তোর বাসায় তোদের দীক্ষা হবে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। মৃতা স্ত্রীর সহিত একত্রে দীক্ষা হইবে এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া পরদিবস আহুত, অনাহুত, রবাহুত বহু লোক রমেশবাবুর বাসায় সমবেত হইলেন। ক্রমে দীক্ষার সময় উপস্থিত হইল, রমেশবাবু দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিলেন। কৌতুহলাক্রান্ত আগন্তুকগণ উৎগ্রীব হইয়া দীক্ষার খবর জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ক্রমে দীক্ষা কার্য্য শেষ হইল। রমেশবাবু সহাস্য বদনে বাহির হইয়া আসিলেন। উৎকণ্ঠিত লোকগণ রমেশবাবুর প্রমুখাৎ শুনিতে পাইলেন সত্য সত্যই তাঁহার স্ত্রীর সহিত একত্রে দীক্ষা হইয়াছে। ইদিলপুরের শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু এই ঘটনার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর উপস্থিত ৩।৪ শত লোক রমেশবাবুর বাসায় খিচুরী, মিষ্টান্ন, সন্দেশাদি দ্বারা ভূরি ভোজনান্তে এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার কথা বলাবলি করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কি মন্ত্রে পূজা করিব?

ইদিলপুরের রাসবিহারী বাবুর সহিত যখন স্বামীজীর প্রথম দেখা হয় তখন তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আমি কি মন্ত্রে আপনার শ্রীচরণ পূজা করিব?" তাহাতে স্বামীজী রাসবিহারী বাবুকে কানে কানে তাঁহার ইষ্ট মন্ত্রটী বলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই মন্ত্রে পূজা কর।"

স্বামীর ইষ্ট মন্ত্রে স্ত্রীর দীক্ষা।

১৩২৪ সনে ঠাকুর যখন দ্বিতীয় বার বরিশাল গিয়াছিলেন তখন সন্দীপ হইতে মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার বৃদ্ধা পত্নী সহ ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আসেন। ব্রাহ্মণটী তাঁহার প্রথম বয়সে কোন মহাত্মার নিকট দীক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার স্ত্রীর দীক্ষা হইয়াছিল না। ইতিমধ্যে তাঁহার গুরু দেহ-রক্ষা করেন, ব্রাহ্মণীর আর দীক্ষা হইতে পারিল না। ব্রাহ্মণ বহু স্থানে বহু সাধুর নিকট তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার কথা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীর দীক্ষা মন্ত্র অবগত না থাকায় কেহই ঐ মন্ত্রে স্ত্রীকে দীক্ষা দিতে পারিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণটী অচল অটল। তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার নিজ ইষ্টমন্ত্র ব্যতীত কিছুতেই অন্য মন্ত্রে স্ত্রীকে দীক্ষা দেওয়াইবেন না। ইতিপূর্ব্বে সন্দীপ বারের উকীল বাবু রাজকুমার ঘোষ কুমিল্লায় ঠাকুরের নিকট দীক্ষা পাইয়াছিলেন, তিনি ঐ ব্রাহ্মণের সঙ্কল্পের কথা জানিতেন। তিনি সন্দীপ গিয়াই ঐ ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে তিনি যদি অমুক তারিখ মধ্যে বরিশাল যান এবং স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা বলেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া বরিশাল আসিলেন, একদিন স্বামীজী ঘরের ভিতর দীক্ষা দিতেছেন, ঐ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটী নারিকেল হস্তে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। সকলের দীক্ষা কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বাবু কিশোরীমোহন রায় চৌধুরী ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এখানে বসিয়া আছেন কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—

আমার স্ত্রী অদীক্ষিতা, তাহাকে যদি স্বামীজী আমার ইষ্টমন্ত্র দ্বারা দীক্ষা দিতে পারেন তবেই তাহার দীক্ষা হইবে, নতুবা নহে। কিশোরী বাবু তাঁহাদিগের সঙ্গে দীক্ষা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, ঠাকুর সকলকে দীক্ষা দিয়া যেই মাত্র বাহির হইলেন অমনি কিশোরী বাবু বলিলেন— "বাবা, এই ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার ইষ্ট মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার প্রার্থনা করিতেছে। ঠাকুর "আও" বলিয়াই তাহাদিগকে নিয়া পুনঃ দীক্ষা গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দীক্ষা ঘর হইতে বাহির হইলেন। কিশোরী বাবু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?" ব্রাহ্মণ বলিল—ঠাকুর দীক্ষাঘরে প্রবেশ করিয়াই আমাকে কিছু না বলিয়া আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন। পরে আমাকে বলিলেন, "দেখ্ তোর স্ত্রীকে এই মন্ত্রে দীক্ষা দিলাম," এই বলিয়া ঠাকুর আমার দীক্ষা মন্ত্রটী অবিকল আমার কানে কানে বলিয়া দিলেন। আমি অমনি ঠাকুরের পায় পড়িয়া গেলাম।" আমারও পুনঃ দীক্ষা হইয়া গেল। আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে।

১৩২৪ সনের কার্ত্তিক মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, নোয়াখালী, লামচর ও অন্যান্য স্থানে আগমন উপলক্ষে যে সব বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

লামচরে পরামর্শ—ঢাকায় সিদ্ধান্ত।

পত্রদ্বারা জানা গেল ঠাকুর ২২শে কার্ত্তিক ঢাকা পদার্পণ করিয়াছেন এবং তথা হইতে চাঁদপুর হইয়া নোয়াখালী, লামচর প্রভৃতি স্থানে আসিবেন। লেখক ওকালতি ব্যবসায় করিতেছি, আমার কাছারী ৩রা অগ্রহায়ণ খুলিবে। তিনি লামচর আসিবেন, ইহা শুনিয়াও কোন উৎসাহ পাইতেছি না, কাছারী খুলিলে যদি তিনি আসেন তবে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইবে,—ইত্যাদি ভাবিয়া অস্থির ভাবে দিন কাটাইতেছি। ২৩শে কার্ত্তিক শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আহ্নিক করিতে বসিয়াছি ; মরা গাঙ্গে বাণ ডাকার ন্যায় হঠাৎ এই শুষ্ক প্রাণে একটা উৎসাহের জোয়ার অনুভব করিলাম। মনে হইল ঠাকুর যদি কাছারী খোলার পূর্ব্বে লামচর আসেন তবে বড়ই ভাল হয় এবং আমরা যদি কেহ লামচর হইতে ঢাকা যাই তবে নিশ্চয়ই এই সময় ঠাকুরকে লামচর আনিতে পারিব। কাছারী খুলিলে নিশ্চিন্ত মনে ঠাকুরকে নিয়া লামচর উৎসবাদি করিতে পারিব না ; পরন্তু তৎপূর্ব্বে আসিলে শান্তির সহিত তাহা পারিব। আরও মনে আসিল আগামীকল্য শনিবার ঢাকা রওনা হইয়া গেলে যদি সোমবার ঠাকুরকে নিয়া ঢাকা হইতে রওনা হওয়া যায় তবে মঙ্গলবার কি অন্ততঃ বুধবার পর্য্যন্ত লামচর পৌঁছান যায় এবং বুধবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত যদি ঠাকুর লামচর অবস্থান করেন তবে সব দিক রক্ষা পায় ইত্যাদি। জোয়ারের জলের ন্যায়

প্রবলবেগে এসব চিন্তা স্রোত চিত্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দিল, আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। সন্ধ্যা বন্দনাদি ভালরূপে হইল না, উঠিয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি গুরু-ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণকুমার দের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদের একজনকে নিয়া ঠাকুরকে আনার জন্য ঢাকা যাওয়া সম্বন্ধে আলাপ করিলাম। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও বিশেষ কিছু সহানুভূতি পাইলাম না। এই আলোচনা হইল যে যদি ঠাকুর অন্ততঃ বুধবার লামচর আসেন তবেই সবদিক রক্ষা পায়। কারণ ঐ বাড়ীর ছেলেদের তৎপরবর্ত্তী সোমবার কলেজ খোলা, তাহারা পরীক্ষার্থী; কিছুতেই শনিবারের বেশী বাড়ী থাকিতে পারিবে না। সোমবার আমার কাছারী খোলা, কৃষ্ণকুমার বাবুরও ঐদিন এক নিলামের তারিখ। সুতরাং সকলেরই নানাবিধ ঠেকা, যা'হউক তবুও মনে ভারী উৎসাহ, ঢাকা গেলেই তাঁহাকে শনিবার মধ্যে লামচর আনা যাইবে এবং সব গোলমাল চুকিয়া যাইবে। কিন্তু ঠাকুরকে পীড়াপীড়ি করিয়া আনা হইবে না, ঠাকুর ইচ্ছা করিয়া যে দিন আসেন সেই দিনই মানিয়া নিতে হইবে। তাঁহার কথার উপর আর কোন কথা বলা হইবে না, ইহাই সকলের মত হইল। কিন্তু কেহই ঢাকা যাইতে প্রস্তুত হইলেন না। বিষণ্ণ মনে সে রাত্রি বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন শনিবার আবার সে-বাড়ী গেলাম, কিন্তু ঢাকা যাওয়ার জন্য কাহাকেও পাইলাম না। বাড়ী আসিয়া মনে মনে সংকল্প করিলাম, কেহ না গেলেও আমি একাই যা'ব, ঠাকুর না আসিলেও অন্ততঃ বন্ধের এই কয় দিন তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারিব। দ্বিপ্রহরের সময় সংকল্পানুযায়ী হাটিয়া সোনাপুর বন্দরে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে নৌকাযোগে চাঁদপুর গিয়া ষ্টিমার ধরিতে হইবে। কিন্তু তখন এক দণ্ড মাত্র বেলা আছে, একা নৌকা ভাড়া করিয়া গেলে অধিক খরচ, বিশেষতঃ কোন

মাঝি এ সময় নৌকা ছাড়িয়া ষ্টিমার ধরাইয়া দিতে স্বীকার করিতেছে না। এমন সময় একজন মাঝি বলিল, "বাবু, যদি এই মুহূর্ত্তেই নৌকায় উঠেন তবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

আমিও স্বীকার করিলাম। নৌকায় উঠিব, ঠিক এই সময় একজন সঙ্গী জুটিল। আরো একজন আসিল। তিন জন নৌকা করিয়া রওনা হইলাম, ষ্টিমার ছাড়িবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে ঘাটে পৌছিয়া ষ্টিমারে উঠিলাম। ভাড়ার টাকা ব্যতীত মাঝিকে কিছু বক্‌সিস দিলাম।

২৫শে কার্ত্তিক রবিবার ১০॥ টার গাড়ীতে নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা পৌছিয়া গেণ্ডারিয়া গোস্বামী প্রভুর আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। তথায় গিয়া, গোস্বামী প্রভুর শিষ্য অশ্বিনী ব্রহ্মচারী মহাশয় দুইজন লোককে কিছু উপদেশ দিতেছেন শুনিলাম, তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। কথায় কথায় ব্রহ্মচারী মহাশয় একটী ঘটনা বলিলেন। তাহা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বিষয়টী উপাদেয় বোধে এস্থলে বিবৃত করিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, "বদরিকাশ্রমে সুত যে স্থানে ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন এবং মুনি ঋষিগণ পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে স্থান এখনও বিদ্যমান আছে। তাহার নিকট একটী কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ড হইতে একটী স্রোত বাহির হইয়াছে। তথাকার সাধুগণের মুখে ব্রহ্মচারী মহাশয় শুনিয়াছেন যে, ঐ স্রোতের কিনারায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে নাম করিলে এক অপূর্ব্ব কাহিনী শুনা যায়। ব্রহ্মচারী মহাশয় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ স্রোতের পাড়ে বসিয়া নাম করিতেছিলেন, তখন তিনি সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত এই ভাবের কথা শুনিতে পাইলেন, "আমি পুণ্য আছি দাঁড়াইয়ে, আমি পুণ্য আছি দাঁড়াইয়ে।"

গেণ্ডারিয়া হইতে রূপবাবুর বাড়ীতে যাইয়া শুনি, তিনি তেঘরিয়া গিয়াছেন। আমি তথাকার পথ চিনি না। কোন্ পথে

কি ক'রে তথায় যাইতে হইবে কিছুই জানি না। অনুসন্ধানে জানিলাম খেওয়া পার হইয়া বুড়ীগঙ্গার অপর পারে যাইতে হইবে। খেওয়া ঘাটে গেলাম, নৌকায় উঠিয়া মাঝিকে তে-ঘরিয়ার পথ জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল, "ঐ যে একটী লোক বসিয়া আছে, সেও তে-ঘরিয়া যাইবে।" আমি নিজকে ধন্য মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঐ লোকটীর সহিত রওনা হইলাম এবং যে বাড়ীতে ঠাকুর আছেন (বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ বসু, উকিল, কুমিল্লা) ঠিক সেই বাড়ীতেই আমাকে পৌছাইয়া দিয়া ঐ লোকটী অন্যত্র চলিয়া গেল। আমি ঐ বাড়ীর প্রাঙ্গনে পৌছিতেই সব গুরু-ভাইগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমাকে কোল দিতে আসিলেন। তাঁহাদের আনন্দের বিষয় এই যে, আমি লামচর হইতে আসিয়াছি এবং তাহার কারণ এই—ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে সকলকে বলিয়াছিলেন যে তিনি সোমবার ঢাকা হইতে রওনা হইবেন। কিছুতেই সোমবারের বেশী ঢাকা থাকিবেন না। মঙ্গলবার চাঁদপুর থাকিয়া লামচর রওনা হইবেন। গুরু-ভাইগণ চিন্তা করিতেছেন তাঁহারা কি ক'রে ঠাকুরকে লামচর পৌছাইয়া দিয়া আসেন। গুরু-ভাইদের মুখে ঠাকুরের লামচর যাওয়ার প্রোগ্রাম শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমরা লামচর বসিয়া ২৩শে কার্ত্তিক শুক্রবার সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণকুমার বাবুদের বাড়ীতে বসিয়া যে ভাবে ঠাকুরের লামচর আগমনের একটা কাল্পনিক রুটীন করিয়াছিলাম এবং যে ভাবে আসিলে আমাদের সকলের সুবিধা হয়, পরস্পর আলোচনা করিয়াছি, আমার ঢাকা যাওয়ার পূর্ব্বদিন ঠাকুর ঠিক সেই ভাবেই তাঁহার লামচর যাওয়ার সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি ২৪শে তারিখ শনিবার আমি লামচর হইতে ঢাকা রওনা হওয়ার অল্প পরেই ঢাকা হইতে লামচর এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে—"Swami Maharaj reaching Chandpur

Monday on his way to Lamchar and Noakhali." এসব শুনিয়া ঠাকুর অন্তর্য্যামী রূপে কি ভাবে কাজ করেন এবং সব দিক রক্ষা করিয়া চলেন তাহা ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম।

লামচরে আগমন।

ঠিক আমাদের সংকল্পানুযায়ী ঠাকুর ঢাকা হইতে রওনা হইয়া মঙ্গলবার চাঁদপুর অবস্থান করতঃ বৈকালে নৌকাযোগে লামচর রওনা হইলেন। বুধবার প্রাতে লামচর পৌঁছার কথা। বুধবার সোনাপুর বাজারে পৌঁছার পূর্ব্বে নৌকায় বসিয়া, কোন্ দিন কোথায় কি ভাবে ঠাকুরের সেবা হইবে তাহা মনে মনে ভাবিতেছি—এমন সময় ঠাকুর আমাকে বলিয়া উঠিলেন, "কিরে, আজ মধ্যাহ্নে তোদের বাড়ী হবে নারে?" আমি কি উত্তর দিব ঠিক করিতে পারিতেছি না। কারণ বাড়ীতে কি ভাবে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা আমার জানার কোন সুযোগ নাই। বলিলাম, "কি জানি, তাঁহারা বাড়ীতে কি ভাবে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাত বলিতে পারি না।" ঠাকুর যে এদিন এই হতভাগার বাড়ীতে পদার্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তবুও তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যা' হউক, ক্রমে লামচর আসিয়া পৌঁছিলাম, আসিয়াই অনুসন্ধানে জানিলাম সে দিন আমাদের বাড়ীতেই ঠাকুরের ভোগ হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে। ঠাকুর ৪ দিন লামচর অবস্থান করিয়া সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া আগামীকল্য রওনা হইয়া যাইবেন, আমরা যে ভাবে ঠাকুরের আগমন, অবস্থান ও প্রস্থান কামনা করিয়াছিলাম, ঠাকুর অন্তর্য্যামীরূপে সে সমস্তেরই সুব্যবস্থা

করিয়া লামচর হইতে প্রস্থান করিলেন। আমরা কিন্তু আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা ঠাকুরকে কিছুই জানাই নাই।

ঠাকুরের প্রসাদে খোকার অন্নারম্ভ।

আমার প্রথমা পত্নী চপলাবালা ঠাকুরের লামচর অবস্থান কালীন আমাকে একদিন বলিল, "ঠাকুরের নিকট আমার অনেক কথা আছে, একান্ত নির্জ্জন চাই। কেহই থাকিতে পারিবে না, আমাকে এমন সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।" আমি এমন সুবিধা কি করে করিব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় ভক্ত স্রোত অনবরত চলিতেছে, একটু বিরাম নাই। কখন যে নির্জ্জন পাইব তাহা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অদ্য ১লা অগ্রহায়ণ শনিবার, ঠাকুর আগামীকল্য চলিয়া যাইবেন, এই কয় দিন সন্ধ্যা-আরতি কৃষ্ণকুমার বাবুদের বাড়ীতেই হইয়াছে, অদ্য অনেক চেষ্টা করিয়া আরতির কার্য্য আমাদের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইল। আরতির পর কিছুক্ষণ কীর্ত্তনাদিও হইল। গান বাজনা থামিয়া গেল, ঠাকুর শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। জনস্রোত অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, ক্রমে রাত্র প্রায় ১২টা হইল। ঠাকুর একটু দুধ পান করিলেন, ঘরে অন্য কেহই নাই, এমন সময় আমার স্ত্রী সহ আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। কিছুক্ষণ আমিও ছিলাম, পরে সে আমাকেও বাহির করিয়া দিল। ঠাকুরের সহিত তাহার কিছুক্ষণ আলাপের পর আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র ঠাকুর আমাকে একটী কথা বলিলেন যাহাতে আমার বহু দিনের একটা ধাঁধা কাটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ ঠাকুরের সহিত আলাপের পর আমি ঠাকুরকে বলিলাম, "বাবা, আমার একান্ত ইচ্ছা শ্রীমান্ খোকার (বর্ত্তমান নাম কল্যাণময়; ডাক নাম কাণু) অন্নারম্ভ আপনার মুখের প্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করি।" একথা শুনিয়া ঠাকুর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওই বেটীত সবই সারাইয়া নিয়াছে, সে কি তা বাকী রাখিয়াছে ? গোপনে গোপনে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, না দেখাইয়া প্রসাদ মুখে দেওয়াইয়া ফেলিয়াছে।" আমি শুনিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমার মনে মনে এরূপভাবে খোকার অন্নারম্ভের কার্য্য করার অভিপ্রায় থাকিলেও স্ত্রীলোক বলিয়া পাছে কোনরূপ অশ্রদ্ধার ভাব আসে তজ্জন্য ইহা শ্রীমতীকেও বলি নাই। কিন্তু সে যে এরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস সহকারে, পক্ষান্তরে আমাকেও না জানাইয়া এরূপ বুদ্ধিমতীর ন্যায় একান্ত হুশিয়ারির সহিত একাজ করিবে তাহাত কল্পনাও করিতে পারি নাই। যা'হউক, তাহার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও বুদ্ধি যে আমাকেও হারাইয়াছে তাহাতে বড়ই আনন্দ হইল। আমার মনে হইতে লাগিল ঠাকুর একথা বলিলেন কিরূপে ? বোধ হয়, শ্রীমতী ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরকে এবিষয় কিছু বলিয়া থাকিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বাড়ী আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে এসম্বন্ধে ঠাকুরকে কিছুমাত্র বলে নাই। এমন কি কেহই এ সম্বন্ধে জানে না। আমাদের বাড়ীতে অন্য মধ্যাহ্ন সময় ঠাকুরের ভোগ হইয়া যাওয়ার পর, ঠাকুর যখন বিশ্রামার্থ গৃহান্তরে উপবিষ্ট আছেন, তখন সে খোকাসহ ভোগের ঘরে প্রবেশ করিল ; সে স্থানে অন্য কেহই ছিল না, ঘরের দরজা, জানালা বন্ধ, ঠাকুরের ভুক্তাবশিষ্ট মিষ্টান্ন হইতে সে গোপনে একটু লইয়া খোকার মুখে দিয়াছে মাত্র। সুতরাং ঠাকুরের মুখ হইতে এ হেন গুপ্ত কথা ব্যক্ত হওয়াতে সে নিজেও বিস্ময়ে অভিভূত হইল, যে কাজ সে এত গোপনে,

এত সন্তর্পণে সর্ব্বপ্রকার পার্থিব চক্ষুর অগোচরে—এমন কি নিজ স্বামীকেও না জানাইয়া করিয়া ফেলিল সে কথা ঠাকুর জানিলেন কিরূপে?

যাহা হউক এই কথার পর ঠাকুরের সহিত আমার অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইতেছে, শ্রীমতী ঠাকুরের চৌকির নিম্নে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছে, "ঠাকুরকে একটী কথা বলিতে হইবে,—আমার স্বামীর শরীর নিতান্ত খারাপ, রুগ্নদেহ, ভগ্নস্বাস্থ্য, একটু মোটা সোটা হউক, ইহারও একটু ভাব আছে—আমার মতই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হউক।" ঠিক এই সময় ঠাকুর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "দেখ ও বেটী বলিতেছে তুই তার মত মোটা সোটা হস্ ও ঠিক তুই তারি মত তাজা হস। দেখ্, একি ভাল কথা!" ঠাকুর চুপি চুপি আমাকে এ কথা বলিয়াই হাসিতে লাগিলেন। আমি মনে করিলাম শ্রীমতী ছেলে মানুষ, মনের আবেগে ঠাকুরের নিকট এসব কথা বলিয়া একটু বোকামিই করিয়াছে। কিন্তু বাসায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমি মুখ ফুটিয়া ঠাকুরকে এসব কথা কিছুই বলি নাই। বলিবার অবসরও পাই নাই। তবে ঐ কথা আমার মনে হইয়াছিল বটে; কিন্তু আমি যাহাতক ঐ কথা মনে মনে ভাবিতেছিলাম, তিনিও তন্মুহূর্ত্তে আপনাকে চুপি চুপি ঐ কথা বলিয়া দিলেন।"

ঠাকুর আমাকে আর একটা কথা সাবধান করিয়া বলিয়া দিলেন। বলিলেন, "দেখ এক বৎসরের মধ্যে আর স্ত্রীসঙ্গ করিও না। কারণে ছেলের অনিষ্ট হইবে।" আমি বলিলাম, "যদি না পারি?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "পারিবি না কেন? দেখ, আমরা এত বৎসর ধরিয়া আছি, আর তুই এক বৎসর পারিবি না।" আমি মনে করিলাম ইহাও শ্রীমতীর কাণ্ড। কিন্তু পরে জানিলাম, সে শুধু মনে মনে এই কথা চিন্তা করিতেছিল, এবং ঠাকুরকে বলিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছিল কিন্তু মুখে কিছুই বলে নাই।

একটু কুইনাইনে ১০৫॥ ডিগ্রী জ্বর শান্তি।

১৩২৪ সনে ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গে লামচর, জিরতলি, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে ঘুরিতেছেন, তৎকালে ইদিলপুরের কিশোরী বাবু সঙ্গে ছিলেন। ঐ সময় তাঁহার হাটুতে একটী টিউমার হইয়াছিল। কিশোরী বাবু এক দিন ঠাকুরকে ঐ টিউমারটী দেখাইয়া বলিলেন, "বাবা, আমি আসন করিয়া বসিতে পারি না, ভারি কষ্ট হয়।" ঠাকুর বলিলেন, "একটু একটু বসিস। না বস্‌লে চলবে কেন?" ইহার ২।৩ দিন পর জিরতলি কাছারীতে বসিয়া ঠাকুর সকলকে উপদেশ দিতেছেন। কিশোরী বাবু ঐ স্থানে বসিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার পায়ে হাত পড়িল, কিন্তু দেখিলেন টিউমারটী নাই। হাতড়াইয়া দেখিলেন, উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। কিশোরী বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দৌড়িয়া গীতাজীকে (*) বলিলেন, "গীতা দাদা, আমার টিউমারটী নাই, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে।" গীতাজী বলিলেন, "এইরূপই ঠাকুরের কাণ্ড, কাহাকেও কিছু বুঝিতে দেন না যে তিনিই এই সব করিতেছেন।" গীতাজী তখন নিজের একটী কাহিনী বলিলেন। গীতাজী বলিলেন, "আমার এক দিন কলিকাতায় ১০৫॥ ডিক্রী জ্বর হইয়াছিল, ঠাকুর সরোজ বাবুকে (†) বলিলেন, "রাজা, আমাকে কিছু কুইনাইন দেত" সরোজ বাবু খানিকটা কুইনাইন আনিয়া দিলেন, ঠাকুর উহার অনেকটাই খাইয়া ফেলিলেন, অল্প একটু আমার বিছানার নিকট আনিয়া বলিলেন, "গীতা, কুইনাইন খা"। আমি উহা খাইলাম। খাওয়ার একটু পরেই জ্বর থামিয়া

(*) হরিদ্বার বাসী ঠাকুরের সঙ্গীয় নিষ্ঠাবান্ পাচক ব্রাহ্মণ।

(†) সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বংশ ও স্বামীজী মহারাজের একান্ত ভক্ত শিষ্য।

গেল; তখনই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়া ঠাকুরের রান্না করিতে গেলাম। ঠাকুরত আগেই জ্বরের দফা, রফা করিয়া রাখিয়াছেন, আত্ম-গোপন করিবার জন্যই কেবল আমাকে একটু কুইনাইন খাওয়াইলেন এবং আমাকে বুঝাইলেন যে ১০৫॥ ডিগ্রী জ্বর কেবল একটু কুইনাইন খাওয়াতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে সারিয়া গেল, আর আমিও তখন তখন বেশ সুস্থ হইয়া পাক করিতে গেলাম।

কমলাকান্তের অভিমান।

সীতাকুণ্ড আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ঠাকুরই ইদিলপুর মূলগ্রাম নিবাসী ৺রাসবিহারী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। আগামী দিন কিশোরী বাবুর বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ হইবে। রাসবিহারী বাবুর বাটীতে আরতি শেষ হইয়াছে, রাত্রি ১১টার সময় ঠাকুর কিশোরী বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ্ কিশোরী, তোদের বাড়ীতে যে একজন ব্রাহ্মণ আছেন, আগামী কল্য তা'কে দিয়া আমার পাক করাবি, কালকের পাক গীতা করিবে না। তাকে দিয়া রাতভর পাক করাবি, আমি তার পাক খ'াব। প্রাতে কিন্তু ৮টার মধ্যে পাক প্রস্তুত চাই।" উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কথাটা শুনিলেন। তিনি ভ্রমণে বাহির হইলে তাঁহার পাক গীতাই করিয়া থাকে। আজ কিশোরী বাবুর বাড়ীর ব্রাহ্মণটীকে ঠাকুর নিজের পাক করিতে বলার হেতু কি?

কিশোরী বাবুর বাড়ীতে, চট্টগ্রাম সুচক্রদণ্ডী গ্রামবাসী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য নামক একজন ব্রাহ্মণ থাকিত, সে বেশ ভাল পাক করিতে পারিত। ইহার পূর্ব্ববারে (অনুমান ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে)

ঠাকুর যখন ইদিলপুর আসিয়াছিলেন তখন কিশোরী বাবু এই ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাহার পাক করা একটী জিনিসও খান নাই। কেবল গীতাজী যাহা পাক করিয়াছিল, তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবার কমলাকান্তকে সাধারণের পাক করিতে অনুরোধ করায় সে বলিল, "বাবু, আমার ভারি অসুখ করিয়াছে, আমি পাক করিতে পারিব না। আপনারা অন্য চেষ্টা দেখুন।" আজ কিশোরী বাবু ঠাকুরের এই আদেশ পাইয়া রাত্র ১২টার সময় বাড়ী গেলেন এবং কমলাকান্তকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া বলিলেন, "কমল উঠ, শীঘ্র উঠ, তোমার প্রতি ঠাকুরের কৃপা হইয়াছে। ঠাকুর তোমার পাক খাবেন বলিয়া অনুমতি করিয়াছেন এবং রাতভর তোমাকে দিয়ে পাক ক'রাতে আমাকে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু প্রভাতে ৮টার মধ্যে পাক প্রস্তুত চাই।" কমল ঐ কথা শুনিয়া তথনই লাফাইয়া উঠিল এবং কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া আনন্দের সহিত পাকের ঘরে প্রবেশ করিল। প্রাতে ৮টার মধ্যে পাক প্রস্তুত হইল। ঠাকুর যে ইহার পূর্ব্ববারে কমলের পাক খান নাই তজ্জন্য কমলের মনে ভারি কষ্ট হইয়াছিল। এবার কমলকে সাধারণের পাক করিতে বলায় তাহার দুঃখভরা অভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল, তাই সে অসুখের ভাণ করিয়া পাক করিতে নিষেধ করিয়াছিল। দয়ার ঠাকুরের বুকে ভক্তের বেদনা বাধিয়াছিল, তাই রাত্র ১১টার সময় কিশোরী বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোদের বাড়ীতে যে ব্রাহ্মণটী আছে তা'কে দিয়া পাক করাবি, আমি তার পাক খা'ব।" কিন্তু ব্রাহ্মণ যে এভাবে ভক্তজন বাঞ্ছিত মধুর অভিমানে গম্ভীর হইয়া আছেন তাহা কেহই জানিত না। অন্তর্য্যামী ঠাকুর কিন্তু সবই বুঝিতে পারিয়া ভক্তের মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

দুই সের লুচির মহোৎসব।

ঐ দিন কিশোরী বাবু মাত্র /২॥ সের আটা আনিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে /॥০ আধ সের পৃথক করিয়া বাকী /২ সের ব্রাহ্মণের পাকে দিয়াছিলেন। ঠাকুর ভোজনে বসিয়া সঙ্গীয় সকলকে (প্রায় ২৫ জন হইবে) উঠানে বসাইয়া দিলেন। ঠাকুর ব্যতীত অপরের জন্য পৃথক খিচুড়ী পাক হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার পাত্র হইতে বাহিরের লোকদের জন্য লুচি পাঠাইতে লাগিলেন; ক্রমে সকলের পাত্র ভরতি হইয়া গেল, তবুও লুচি আসিতেছে। কিশোরী বাবু এতক্ষণ অন্যত্র ছিলেন, তিনি হঠাৎ আসিয়া সকলের পাত্রে প্রচুর লুচি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, ঠাকুর বুঝি অভুক্ত রহিলেন! মাত্র /২ সের আটা!" তাঁহার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে লুচি আনা বন্ধ হইয়া গেল, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বলিয়া উঠিলেন, "আপনি সব নাশ করিয়া ফেলিলেন, আমরা তামাসা দেখিতে ছিলাম, ঠাকুর লুচি পাঠাইতেছিলেন, আর আমরা খাইতেছি, দেখি কত দিতে পারেন। আপনার চীৎকারে সব বন্ধ হইয়া গেল।" ঠাকুরের ভোগের পর দেখা গেল ঠাকুরের পাতেও প্রচুর লুচি রহিয়াছিল।

বোবা ছেলের বাক্যস্ফুরণ।

শ্রীমতী বিভাবতী বসু কিশোরী বাবুর এক বিধবা কন্যা। ঐ বিধবা মেয়েটার একটা বোবা ছেলে ছিল, সে একটী বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারিত না। যে দিন বিভাবতী দীক্ষা পায় সে দিন দীক্ষান্তে কিশোরী

বাবু ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা, আমার এই বিধবা মেয়েটীর এই ছেলেটী কথা বলিতে পারে না। তুমি ইহাকে কথা বলাইয়া দাও।" তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, "আমি বলিলেই সে কথা বলিবে?"

কিশোরী বাবু—হাঁ, নিশ্চয়ই বলিবে।

ঠাকুর—কি করিব?

কিশোরী বাবু—তুমি বল—কথা কও, কথা কও, কথা কও।

ছেলেটী ক্রমে কথা বলিতে আরম্ভ করিল, কথা শিখিল, লেখাপড়াও আরম্ভ করিল। কিন্তু ছেলেটী অল্প বয়সেই মারা গেল।

কে মরে কে বাঁচে।

ঠাকুর ঢাকা শিবরামপুর গ্রামে। কিশোরী বাবু ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন, প্রণাম করিয়া ২।১টী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ঠাকুর যেন অন্যমনস্ক, কিশোরী বাবুর কোন কথার জবাব দিতেছেন না। নিজে নিজে বলিয়া উঠিলেন, "কে মরে, কে বাঁচে", কিশোরী বাবু আর কিছু না বলিয়া ভয়ে ভয়ে ঐ স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন, পরদিন কিশোরী বাবু ঢাকা পৌঁছিয়া শুনিলেন যে পূর্ব্ব দিন ঠিক ঐ সময় ঢাকা স্বামীবাগের মহাত্মা ত্রিপুলিঙ্গ স্বামী দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

রোগীর দরজায় ঠাকুরের আবির্ভাব।

১৩৩৪ সনে কিশোরী বাবু ইদিলপুর বিজনীসার গ্রামে একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি কোন এক পুকুরের ঘাটলায় শুইয়া আছেন। ঠাকুর উপরের সিঁড়িতে শুইয়া আছেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ। কিশোরী

বাবু নিদ্রা হইতে উঠিয়া খুব চিন্তিত হইলেন, ঠাকুরকে বিমর্ষ কেন দেখিলেন, কোথাও কোন খরব পান কি না। জানিবার জন্য ডাকঘরে গিয়াই বজ্রযোগিনী হইতে চিঠি পাইলেন, তাঁহার একটী দৌহিত্রের বসন্ত হইয়াছে। পরদিনই তিনি বজ্রযোগিনী চলিয়া গেলেন. তথা হইতে ঠাকুরকে তার করিলেন, কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেল না। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে চলিয়াছে। একরাত্রে কিশোরী বাবু স্বপ্নে দেখিলেন, সমস্ত আকাশ দিনের মত আলো করিয়া ঠাকুর সেই বাটীতে আসিতেছেন, আসিয়া রোগীর ঘরের দরজায় রোগীর মুখো হইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন। হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে কিশোরী বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া রোগীর ঘরের দরজায় গেলেন। যাইয়া দেখেন বাস্তবিকই স্বপ্নদৃষ্টের অনুরূপ একখানা চেয়ার ঐ ঘরের দরজায় রোগীর মুখো হইয়া বসান রহিয়াছে। ঠিক যেন কেহ বসিয়া এই মাত্র চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়াছে। ঐ চেয়ার ইতিপূর্ব্বে ঐ অবস্থায় তথায় ছিল না। ঐ চেয়ারে ঠাকুরের উপবেশন অনুভব করিয়া কিশোরী বাবু তথায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। রোগীর ঘরে কিশোরী বাবুর মেয়ে ও তাঁহার ধাতৃ-শাশুড়ী ছিলেন। তাহার পরদিন তাঁহার শাশুড়ী বলিলেন, "গতরাত্রে ঐ চেয়ারে কে একজন বড় সুন্দর পুরুষ বসিয়াছিল। আমি দরজা খোলা মাত্রই পশ্চিম মুখো চলিয়া গেলেন। আমি ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। ছেলেটী পরদিন রাত্রে ঐ সময়ই মারা যায়।

তর্পণ করা।

ঠাকুর একদিন কুমিল্লা ক্ষীরদ বাবুর বাসায় উপস্থিত, সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে কে তর্পণ কর?" সভার কেহই কোন

উত্তর করিল না। ঠাকুর তখন বলিতে লাগিলেন, "তোরা যেমন বাহ্য জগতের সমস্তই দেখিতে পারিস, আমরা সেইরূপ অতিবাহিক জগতের সমস্তই দেখিতে পারি, তোরা যখন স্নান করে উঠিস, তখন তোদের মৃত বাপ মা এক গণ্ডুষ জলের জন্য তোদের পাছে পাছে ঘোরে, যদি রীতিমত তর্পণ করিতে নাও পারিস, তবুও স্নান করে উঠার কালে হাটুর উপরের ভিজা কাপড় চিপিয়া "আ-ব্রহ্ম-স্তম্ভ-পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" বলিয়া একটু জল দিস। তোদের মৃত পিতামাতা এই জল মিশ্রিপানার ন্যায় পাইবে।

ঠাকুরের দেহে কালীমাখা।

একবার কিশোরী বাবুর পাকের ঘরে আগুন লাগে, পাকের ঘরে বহু ছন ও লাকড়ী থাকায় আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। পাকের ঘরের ৫।৬ হাত মধ্যে তাঁহার ৩৭ বন্দের এক বড় টিনের ঘর, হোগল পাতার বেড়া। লোকজন আসিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়া খুলিতে গেল, ঐ ঘরে ঠাকুরের ফটো ও আসন ছিল, ঠাকুরের ঘর ঠাকুরই রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাসে কিশোরী বাবু কাহাকেও টিনের ঘরের বেড়া খুলিতে দিলেন না। ক্রমে আগুন নিবিয়া গেল, বড় ঘর রক্ষা পাইল। পরদিন প্রাতে ঠাকুরের আসনের নিকট কিশোরী বাবু পূজায় বসিয়াছেন, পূর্ব্বরাত্রের অনিদ্রা বশতঃ একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, তন্দ্রাবস্থায় তিনি দেখিলেন, ঠাকুর স-শরীরে আসিয়া আসনে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত শরীর কালীমাখা।

রসগোল্লায় ঠাকুরের ভোগ।

কিশোরী বাবুর গৃহ দাহের কয়েকদিন পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী (ডাক নাম ভানু) একদিন প্রাতে দৌড়িয়া আসিয়া কিশোরী বাবুকে বলিল, "বাবা, আর ভয় নাই, ঠাকুর আস্‌ছেন।"

কিশোরী বাবু—তিনি কোথায় আছেন, তুমি কোথায় তা'কে দেখ্‌লে ?

ভানু—আমি তাঁহাকে মনসা বাড়ীতে দেখিয়াছি। তিনি আমাকে রসগোল্লা দ্বারা ঠাকুরের ভোগ দিতে বলিলেন।

কিশোরী বাবু—তিনি এখন কোথায় ?

ভানু—আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি।

ভানুর বয়স তখন ১০ বৎসর, সেও ঠাকুরের নিকট দীক্ষা পাইয়াছে।

ঠাকুর অদ্ভুত লোক।

বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিশোরী বাবুর নিকট তাঁহার নিজের জীবনের একটী কাহিনী বলিয়াছেন, "স্বামীজী যখন ১৩২২ সনে প্রথমবার বরিশাল আসেন তখন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল। আমি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য বলিয়া মনে একটু সঙ্কোচ আসিল। দর্শন করিতে আর গেলাম না, কিন্তু মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, "ঠাকুর, তুমি মহাপুরুষ বলিয়া সকলের মুখেই শুনি, আমি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য

বলিয়াই তোমাকে দর্শন করিতে পারিলাম না; যদি তুমি বাস্তবিকই মহাপুরুষ হইয়া থাক, তবে আমাকে দর্শন দিয়া যাইবা।" আমি ইহার পর রবিবার প্রাতে ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, কাপড় জামা পরিয়া রওনা হইয়াছি, ঠিক এমন সময় বাহিরে লোক সমাগমের শব্দ পাইলাম। দেখি স্বামীজী মহারাজ বহু শিষ্য-সেবক সমভিব্যাহারে আমার বাসায় ফুল বাগানে পাইচারি করিতেছেন। আমি একটু অগ্রসর হইতেই তিনি আসিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের চোখ হইতে টস্ টস্ করিয়া দু-ফোঁটা জল আমার হাতের উপর পড়িল। তিনি আমাকে বলিলেন, "যাও, মন্দিরে যাও, অনেক লোক তোর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" সেইদিন উপাসনায় আমি যেরূপ শান্তি পাইয়াছি সেইরূপ খুব কম দিনই ঘটিয়াছে। তোমাদের ঠাকুর এক অদ্ভুত লোক।

তোদের পাপগুলি আমাকে দে।

বরিশালে ঐ সময় এক সভায় বহু লোক উপবিষ্ট আছেন, ঠাকুর সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেখ মিত্রগণ, আমি দূর হইতে তোদের দুয়ারে আসিয়াছি, আমি কিছু পাইবার আশা করিয়াই আসিয়াছি। তোরা আমাকে কিছু দিবি কি? যদি দিতে পারিস ত বল, আর না হয় বল—দিবি না।" সকলে ভাবিতে লাগিল, ঠাকুর এ আবার বলেন কি? তিনি কি চাহেন, আর আমরাইবা কি দিব? একজন বলিয়া উঠিল, "যদি পারি, দিব।" ঠাকুর বলিলেন, "তোদের পাপগুলি আমাকে দে।" সকলে নীরব হইয়া রহিল।

শূদ্রের প্রণবে অধিকার আছে কিনা ?

১৩২২ সনে বরিশালের একজন ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা,—আমাদের প্রণবে অধিকার আছে কিনা? ঠাকুর বলিলেন, "কেন থাকবে না ?"

ভদ্রলোক—বাবা, আমরা যে শূদ্র।

ঠাকুর—কোন্ শূদ্র হ্যায়।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যকৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাম্ শূদ্রো, জায়ত ॥

সেই বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য, আর পা হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে।

এখন বিচার কর ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কি শূদ্র ব্রাহ্মণ। স্তব স্তুতি করে কে ? ব্রাহ্মণ, না শূদ্র ?

উত্তর—ব্রাহ্মণ।

ঠাকুর—স্তুতি অর্থ খোসামুদি, তোষামুদি করা।

ইহাত শূদ্রেরই কাজ। তবে যে ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়ে গেলরে। আরো দেখ, হাত দিয়ে সেবা করে, না—হাতকে সেবা করে।

উত্তর—হাত দিয়ে সেবা করে।

ঠাকুর—সেবা কার কাজ ?

উত্তর—সেবা শূদ্রের কাজ।

ঠাকুর—তবে যে ক্ষত্রিয়ও শূদ্র হয়ে গেলরে।

আবার দেখ, সেবা করে—কাকে ? মুখকে—না পাকে ?

উত্তর—পাকে।

ঠাকুর—তবে যে শূদ্রই ব্রাহ্মণ হয়ে গেলরে।

বশিষ্ঠ কি ছিল রে—বেশ্যাপুত্র ; নারদ কি ছিল রে—দাসীপুত্র ; ব্যাসদেব কি ছিল রে—চণ্ডালিনী পুত্র ; ভগবানের নাম নিতে কাহাকেও বাধা দিবার অধিকার নাই ।

রুদ্রাক্ষ মহাত্ম্য ।

কণ্ঠির মহাত্ম্য বলিতে গিয়া ঠাকুর একদিন বলিলেন, "দেখ, একদিন এক ব্যাধের একস্থানে হঠাৎ মৃত্যু হইল, শিবদূত ও যমদূত উভয়ে তাহাকে নেওয়ার জন্য উপস্থিত হইল। যমদূত নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, আপনি এখানে কেন ? ইহার এমন কি সুকৃতি আছে যে আপনি ইহাকে কৈলাসে নিতে এসেছেন ?" নন্দী বলিল,— "ইহার ভারি সুকৃতি ; এই ব্যক্তি যে স্থানে মরিয়া পড়িয়া আছে, সেইস্থানে ইহার মাথার নীচে মাটীর মধ্যে আধখানা রুদ্রাক্ষ আছে, সেই পুণ্যফলে সে শিবলোকে যাবে। "যমদূত মাটী খুড়িয়া দেখিলেন বাস্তবিকই মাটীর নীচে আধখানা রুদ্রাক্ষ আছে। যমদূত চলিয়া গেল, শিবদূত ব্যাধকে লইয়া শিবলোকে প্রস্থান করিল।"

ঠাকুর তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যকে দীক্ষার সময়—একটী মন্ত্রপুত রুদ্রাক্ষের কণ্ঠি দিতেন। ঐ কণ্ঠী যাবজ্জীবন রাখার আদেশ আছে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আর কোন মালা রাখ কি না রাখ, রুদ্রাক্ষ কখনও ছাড়িও না।" (সদ্‌গুরু সঙ্গ—৪র্থ খণ্ড)

ঠাকুরের অপূর্ব্ব কৃপা।

১৩২৬ সনের আশ্বিন মাসে লেখক, লেখকের বৃদ্ধ পিতা, মধ্যম দাদা শ্রীতারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী, স্ত্রী শ্রীচপলাবালা, শিশু পুত্র কল্যাণময় (ডাক নাম কানু, তখন বয়স ২॥ বৎসর) সহ ৺ পুরীধাম জগন্নাথদেব দর্শনে যাই। জগন্নাথদেব ও ভুবনেশ্বর শিব দর্শনান্তে বৈতরণী যাইবার পথে রুড়কী বাজারে স্ত্রীর কলেরা হয়। রুড়কী হইতে বৈতরণী (যাজপুর) প্রায় ৮ মাইল দুর, বহু চেষ্টা করিয়াও কোন ডাক্তার কবিরাজের খোজ পাইলাম না। অগত্যা বৈতরণী যাওয়াই স্থির হইল। গরুর গাড়ীতে যাওয়া, গাড়োয়ান রোগীণীকে লইয়া রওনা দিল বটে কিন্তু বলিল, "বাবু, যদি পথে কোন দাস্ত বমি হয় তবে যেখানে দাস্ত বমি হবে সেখানেই রোগীকে নামাইয়া দিব।" গরুর গাড়ী চলিতে পারে এরূপ মাত্র রাস্তার পরিসর; দু'ধার কণ্টকাকীর্ণ; সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে 'জয়গুরু' বলিয়া যাত্রা করিলাম, প্রায় ৪ ঘণ্টার পথ চলিয়া রাত্র ৯টার সময় বৈতরণী পৌহুছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যাহার ঘণ্টায় ৪।৫ বার করিয়া দাস্ত বমি হইতেছিল এই ৪ ঘণ্টার মধ্যে একটী বারও তাহার দাস্ত বমি কিছুই হইল না। বৈতরণী পৌহুছিয়া যেইমাত্র যাত্রী নিবাসে পৌহুছিলাম অমনি তাহার দাস্ত বমি আরম্ভ হইল। ঠাকুর রোগিণীকে নিরাপদে বৈতরণী পৌহুছাইয়া দিলেন। পরদিন যাজপুর হাসপাতালে স্থান লইলাম। হাসপাতালে ১০ দিন রোগে ভুগিয়া আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বিবাহের অল্প পরেই, যখন তাহার বয়স ১৩।১৪ বৎসর, তখনই সে ঠাকুরের কৃপা পায়। ঐ অল্প বয়স হইতেই সে সাধনভজনে একান্ত নিষ্ঠাবতী শ্রদ্ধাপরায়ণা এবং ঠাকুরের প্রতি একান্ত অনুরক্তা ছিল। সে প্রায়ই স্বপ্নে ঠাকুরের দর্শন

পাইত ও ঠাকুর স্বপ্নাবস্থায় তাহাকে নানা উপদেশ দিয়া যাইতেন। * হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে প্রায় সর্ব্ববিধ অনুকূল অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে। কার্ত্তিক মাস, গুরুবার, অমাবস্যা তিথি, মহারাত্রি, বিরজাক্ষেত্রে, বৈতরণী তীর্থে, শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ব্যতীত অপর অন্ন গ্রহণের পূর্ব্বে, পতিপুত্র, শ্বশুর, ভাসুর সমক্ষে, দীপান্বিতা ৺কালিকা পূজার শঙ্খ, ঘণ্টা-কাঁশর-ধ্বনি মুখরিত উজ্জ্বল দীপাবলির দিব্যালোকে হাসিতে হাসিতে নশ্বরদেহ ছাড়িয়া সে অমরধামে চলিয়া গিয়াছে। যাজপুর হাসপাতাল লোকালয় হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। কোথাও জন মানবের সাড়া শব্দ নাই, একে অমাবস্যা রাত্রি, তাহাতে কলেরা রোগ; হাসপাতালে মধ্যম দাদারও জ্বর কফে অজ্ঞান অবস্থা; বৃদ্ধ পিতা ও শিশু পুত্র কানুকে সঙ্গে নিয়া অপর সঙ্গীগণ পূর্ব্বেই কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে সস্ত্রীক এক পড়সী গুরুভাই শ্রীযুক্তদ্বারকা নাথ দত্ত আছেন, কিন্তু তিনিও কায়স্থ; এহেন অবস্থায় এই অমাবস্যা রাত্রিতে হাসপাতালে এই মৃতদেহ নিয়া কি করা! একা বলিতে এখন আমি সম্পূর্ণই একা বটা। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদেশে ঐহিক জীবনের একমাত্র প্রিয় সহচরীর মৃত্যু, তা-ও কলেরা রোগে, আমি সম্পূর্ণ একেলা। তৎকালীন মনের অবস্থা বোবার স্বপ্ন প্রকাশের ন্যায় ভাষায় বিবৃত করা অসম্ভব। কি করিব, দিশাহারা। পত্নীর মৃতদেহ ও অর্দ্ধমৃত ভাইটাকে ঐ পড়সী বন্ধুর (*) নিকট রাখিয়া "জয়গুরু" বলিয়া ঐ মহানিশার অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলাম। "ঠাকুর! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" গুরুদেবের চরণ উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া দিশাহারা পথিকটীর মত আঁধারে হাটিতে লাগিলাম। হাসপাতালের

* ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাবু দ্বারকানাথ দত্ত, নিবাস লামচর।

কম্পাউণ্ডারটীর অল্প বয়স হইলেও বেশ ভাল মানুষ। সে আমার স্ত্রীকে শ্রদ্ধার সহিত প্রাণ দিয়া সেবা করিত। তাহাকে ডাকিলাম, বাহিরে আসিয়াই এই শুভ সংবাদ শুনিবামাত্র সে আমার সহকারী হইল। কোথায় যাইব তা' ঠাকুরই জানেন। এই বন্ধুবিহীন দেশে বিশেষতঃ অ-বাঙ্গালা ভূমে আমি বাঙ্গালী. কাহার কাছে এই মর্ম্মবাণী বলিব, আর কে-ই বা আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া দু'ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবে! হঠাৎ মনে হইল ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী কোয়াসারপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু গোবিন্দ প্রসাদ বসু মহাশয়ের বাড়ী যাই। তিনি একদিন হাসপাতালে শ্রীমতীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মনে হইল তিনি যদি এ হতভাগ্যের জন্য কিছু করেন, তবে রক্ষা; কিন্তু আমি তাঁহার বাড়ীর পথ চিনি না। কম্পাউণ্ডারটী পথ চিনাইয়া চলিয়াছে, আমি তাঁহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখি তিনজন লোক একটী হেরিকেন সহ আমাদিগের দিকে আসিতেছে, ক্রমে সম্মুখবর্ত্তী হইলে লক্ষ্য করিলাম, একটী চাকর ও শ্যালক সঙ্গে ঐ জমিদার বাবুটী আসিতেছেন। আমিত দেখিয়াই বিস্ময়ে অভিভূত, যাঁহার জন্য এই রাত্রে অতদুর পথ চলিয়া আসিতেছি নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পথেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি আর কি বলিব, ভাব নাই, ভাষা নাই, দুঃখের গভীরতা হইতে কেবল এই কথা উঠিল, "বাবু, আমারত এই অবস্থা, আপনার নিকটই চলিয়াছি।" বাবুটী উত্তরে যাহা বলিলেন তাহাতে আমার জীবন্মৃত দেহটীও হর্ষ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—মরাগাঙ্গে জোয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "আপনার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ একটু পূর্ব্বেই আমি পাইয়াছি, একজন আসিয়া এই খবর বলিয়া গিয়াছে। এই দেখুন আমরা আপনার উদ্দেশ্যেই হাসপাতালের দিকে রওনা হইয়াছি"। ইহার প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নীরবতা ভিন্ন ইহ জগতে আর কিছু

আছে কিনা জানি না। আমি কিন্তু নীরব হইয়াই রহিলাম এবং আর একবার গুরুদেবের শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম।

আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে রাত্র ৮ ঘটিকার সময়; সেই সময় ঐ হাসপাতালে অন্য কোন রোগী ছিল না এবং উহা লোকালয় হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। তাহার মৃত্যুতে কান্নাকাটী বা "হা-হতাশ" করিবার একটী প্রাণীও তথায় ছিল না। সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে সে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা নিকটে বসিয়াছিল তাহারাও নীরব, আমিও নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি। জমিদার বাবুটীর বাটী হাসপাতাল হইতে প্রায় ২।৩ মাইল দূরে। যখন পথে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন রাত্র অনুমান ৯ ঘটিকা। গোবিন্দ বাবু আমার স্ত্রীর সংবাদ পাইয়া আহারাদি সমাপনান্তে অন্ততঃ খানিকটা বিশ্রাম করিয়া রওনা দিতে এবং যেস্থানে আমরা মিলিত হইয়াছি তথায় পৌঁছিতে কম পক্ষেও এক ঘণ্টার কমে হইতে পারে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেহ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গেলেও ½ ঘণ্টার কমে তথায় পৌঁছিতে পারে না। সাইকেল বা অন্য গাড়ী ঘোড়া তথায় তখন ছিল না। থাকিলেও কেহই তন্মুহূর্ত্তে ঐ খবর জানে নাই। আমিও কাহাকে কিছু বলি নাই। বলিলেও কে এমন প্রাণের দরদী জুটিবে যিনি এই অমানিশার অন্ধকারে প্রাণপণে দৌড়িয়া অনাহুতভাবে ঐ বাবুটীকে এই খবর দিবেন! আর বাবুটীই বা কোন্ স্বার্থে, কি প্রলোভনে, কাহার ইঙ্গিতে সুখী দেহের আরাম শয্যা পরিত্যাগ করিয়া এমন কি আহারান্তে বিশেষ বিশ্রামটুকু পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া এই হতভাগ্যটীর জন্য ছুটিয়া চলিবেন? ঠাকুর, তোমার চরণাশ্রিত অসহায়জনের একমাত্র ভরসাস্থল একমাত্র দরদী এই বেতার বার্ত্তাবহ দ্রুতগামী দূত তুমি ভিন্ন আর কে? তুমিইত অন্তর্য্যামীরূপে তোমার দাসের জন্য গোবিন্দবাবুর হৃদয়ে প্রেরণা

জাগাইয়া এই ঘোর অমানিশায় ছুটিয়া চলিতে তাঁহাকে তাড়া করিয়াছিলে !

জমিদার গোবিন্দবাবু শ্মশানবন্ধু হইতে চলিয়াছেন, তাঁহার খালি পা, একটী যষ্ঠি মাত্র সম্বল ; আমাকে বলিলেন, "শব বহন করার জন্য আপনার ত চারিজন ব্রাহ্মণের দরকার। চলুন, সহর খুঁজিয়া দেখি কোন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পাই কিনা ? এখানে কোন উড়িয়া ব্রাহ্মণ মৃত সৎকারের জন্য পাইবেন না, যেহেতু আপনি বাঙ্গালী।" গোবিন্দ বাবুর বাড়ী যাজপুর সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দুর, হাটিয়া চলিয়াছেন—কোথায় যাবেন ? দীপান্বিতা কালীপূজার রাত্র, যে ২।৪ জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা কালীপূজায় আটক পড়িয়াছে। যা'হউক তাঁহার জানা মতে কোন এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গিয়া দেখেন, ঘরের দরজা বন্ধ, অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি অমুক স্থানে গিয়াছেন। সেখানে যাওয়া হইল, কিন্তু তথায় কালী পূজায় বসিয়াছেন ; 'চল অন্যত্র', সেখানে গিয়া জানা গেল সেও অমুক স্থানে গিয়াছে। 'চল তথায়', এক ব্রাহ্মণ উকীল বাবুর বাড়ীতে যাওয়া হইল ; রাত্রি তখন ২টা ; দোতালায় সকলে নিদ্রিত, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা চীৎকারে দারোয়ান জাগিয়া খবর দিলে ছেলে বাবু নীচে আসিলেন। আমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া মা'র কাছে গেলেন, কিন্তু মা তাহাকে যাইতে দিল না—যেহেতু তাহার পুত্রবধূ অন্তঃসত্বা ! এখানকার আশাও গেল, 'চল অন্যত্র', এভাবে ঘুরিতেছি, আমিত শ্রান্ত, ক্লান্ত অবসন্ন ; গোবিন্দ বাবুর কিন্তু উদ্যম উৎসাহের অবধি নাই। তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখুন, আপনি নিরাশ হবেন না। যিনি এ হেন মহারাত্রিতে এই বিরজা ক্ষেত্রে বৈতরণী তীর্থে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি মানবী নহেন—দেবী, এহেন দেবীর দেহ সৎকারের জন্য কখনও ব্রাহ্মণের অভাব হইবে না। শবদেহও

বাসী-মরা হইবে না। গোবিন্দ বাবু পঞ্চাশোর্দ্ধ বৃদ্ধ ; অত্যন্ত স্থূলকায়, সুথীদেহ, সম্মানিত জমিদার। এই হতভাগ্যের কর্ম্মফলে তিনি আজ যাজপুর সহরের রাস্তা, পল্লী গল্লি রাত্র ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পদব্রজে ঘুরিতেছেন। রাত্র অনুমান ৩ ঘটিকার সময় বহু চেষ্টায় মাত্র তিনটী ব্রাহ্মণের যোগাড় হইল। কাষ্ঠ, তিল, তণ্ডুল, নববস্ত্রাদি হিন্দুর মৃত সৎকারের যাহা যাহা প্রয়োজন, এই গভীর রাত্রে দোকানদারগণকে বহু শ্রমে জাগাইয়া সব সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অবশেষে ঐ তিনটী ব্রাহ্মণসহ হতভাগ্য আমি, হৃদয়ে শোকের বোঝা আর স্কন্ধে শবের খাঁচা লইয়া "হরিবল, হরিবল" বালতে বলিতে "শেষের সে-দিনের" শান্তিভূমি শ্মশানক্ষেত্রে রওনা হইলাম। বৈতরণী তীরে সর্ব্ব-সন্তাপ-হারি হুত-বহ-মুখে ইহজীবনের সদানন্দময়ী সেই সুন্দর শীতল প্রতিমাখানি আহুতি প্রদান করিলাম। জমিদার গোবিন্দবাবু চিতার শেষ চিহ্ন বিধৌত করিবার সময় পর্য্যন্ত নিজ শ্যালককে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পরদিন বেলা ৮ ঘটিকার সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হৃদয়বান্ বিশ্বাসী পাঠক! স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, এই বন্ধু-বিহীন দেশে এই বিভীষিকাময়ী গভীর রজনীতে এহেন সঙ্কটাবস্থায় কাঁহার কৃপায় আমার মত ক্ষুদ্র নিঃসম্বল চড়ুইপাখী এই বিশাল বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিল? ইনিও কি সেই দ্রুত—বার্ত্তাবহ দরদী দূত নহেন?

স্ত্রীর মৃত্যুতে ঠাকুরের সান্ত্বনা।

বৈতরণী তীর্থে আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঠাকুরের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলাম তদুত্তরে ঠাকুর যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া গেল :—

হরিদ্বার—

২৮।১০।২৯ইং—

ওঁ

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার পত্নী বড়ই সৌভাগ্যবতী, তাই পতি সাক্ষাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথজীর দর্শনান্তে তীর্থ যাত্রাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তাহার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদনান্তর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে ও কিছুকাল গতে সবদিক্ বিচার করতঃ যে করিতে হয়, করিবে ; ব্যস্ত হইও না।

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাম্ প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং।
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয় তরঙ্গভঙ্গ চপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং।
তস্মাত্ত্বাং শরণাগতঃ শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা।

সেই শরণদাতার প্রতি নির্ভর কর ; তিনি মঙ্গলময়, নাম ও দানে মতি রাখিয়া, শূরের ন্যায় অগ্রসর হও। চিন্তা কি বাছা! পিতামাতা স্ত্রী পুত্র সহ ব্যবহারিক সম্বন্ধ প্রীতি স্নেহাদি দেখাইতে হয়। অন্তরে জানিবে কেহ কারো নয়।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্নদাতা
ন পুত্র ন পুত্রী ন ভৃত্যোন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তিমমৈব—
গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী॥

ঈশ্বরে নির্ভর ও বিশ্বাস পূর্ণ না হইলেই চঞ্চলতা আসিয়া উপস্থিত হয়। খুব বিশ্বাস করিবে, তিনি মঙ্গলময়; পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলে অত্র শরীরে সুখ দুঃখাদির ভোগ হয়। এমন পুরুষকার কর যাহাতে সুখ দুঃখে মুগ্ধ হইতে না হয়।

আশীর্ব্বাদক—
স্বামী ভোলানন্দ গিরি।

স্বপ্ন বৃত্তান্ত।

আমার মৃতা স্ত্রী চপলাবালা দেবীর জীবিতাবস্থায় স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া ঠাকুর যে সব উপদেশ ও কথা বার্ত্তা বলিতেন তাহা তাহার নিজ হস্ত লিখিত বই হইতে অবিকল নকল দেওয়া হইল।

(১)

ঋতুর চারিদিনের দিন রাত্রিতে দেখি যে ঠাকুর আমাকে কোলে বসাইয়া উপদেশ দিতেছেন:—কাহাকেও গালি দিও না। স্বামীকে সেবা করিবে, ভাসুরকে, বড় জা'কে পিতামাতার রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে এবং শ্বশুরকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে ইতি ১৩২২ সন। ৩রা পৌষ।

(২)

আজ আমার খুব মাথাবেদনা আরম্ভ হইল, তখন আমার কিছুই ভাল লাগিতে ছিল না। একেবারে ক্লান্তি বোধ হইতেছিল। সন্ধ্যা সময় সন্ধ্যা করিতে বসিলাম, কিন্তু মাথার বেদনায় সন্ধ্যা করিতে পারিলাম না। তখন মনে বড়ই অশান্তি বোধ হইল, যাইয়া ঘুমাইয়া রহিলাম; এই অবস্থায় দেখি যে ঠাকুর আমার এক পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছেন ও মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, "শান্তিঃ শান্তিঃ, শান্তিঃ।" তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, সময় সময় আমার মন এত অস্থির হয় কেন?" তিনি বলিলেন, "তুমি বৃথা চিন্তা কর কেন? যেই দিন হইতে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইবে সেই দিন হইতে মন স্থির হয়ে যাবে, সর্ব্বদাই 'নাম' করিবে। নামেই শান্তি, নামেই সুখ, নামেই সব রক্ষা করে। নামই একমাত্র সম্বল।" এই কথা শুনিতে শুনিতে জাগিয়া উঠিলাম। পরে দেখি যে, আমার মাথা বেদনা বা কোন অসুখই নাই। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমার এত মাথা বেদনায় আমি অস্থির ছিলাম, এখন দেখি কিছুই নাই। ইতি ১৩২২ সন ২৬শে পৌষ।

(৩)

অদ্য রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম যে ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়াই বলিতে লাগিলেন, "কিরে বেটী, এখন পর্য্যন্ত পূজা কর নাই কেন, কর, পূজা কর। পূজার সময় চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ গুরু পূজা করিবে, চরণামৃত লইবে, গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। স্বামীর চরণামৃত প্রত্যহ লইবে।" আমি বলিলাম, "তিনি ত আমার নিকট থাকেন না। আমি কি করিয়া তাঁহার চরণামৃত লইব?" তিনি বলিলেন, "চরণামৃত লওয়ার

বাসনা হইলেই লওয়া হয়।" আমি বলিলাম, "আমি চরণামৃত লওয়ার পাত্র এখনও হই নাই।" তিনি বলিলেন, "হয়েছ, হয়েছ, লও চরণামৃত।" আমি বলিলাম, "তিনি কোথায়, কি করিয়া লইব?" তিনি বলিলেন, "ধ্যান করিলে দেখিবে তোমার নিকটেই আছে।" আমি সেইরূপ ধ্যান করিয়া দেখি তিনি আমার নিকটেই আছেন। তখন চরণামৃত লইয়া প্রণাম করিলাম। আবার বলিলেন, "তুই কোন পাপ করিবি না। তুই যেই পাপ করিবি সেই পাপ স্বামীকে দিবি, কিন্তু তাহার পুণ্যের ভাগ তুই নিয়া যাবি। দেখিস্, কখনও কাহাকে গালি দিবি না। সাবধান, নাম কর, নাম ভুলিও না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি জাগিয়া পড়িলাম। ইতি ১৩২২ সন। ২৬শে ফাল্গুন।

(৪)

আজ শেষরাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে আমাদের বাড়ীতে পূবের ঘরের দক্ষিণ কোণে নারিকেল তলায় অল্প বেলা থাকিতে ঠাকুর আসিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়াছেন, আমি তাঁহার এক পাশে শুইয়া রহিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া বসিতে আমি দেখিয়াছি, তবুও উঠিয়া যাইয়া প্রণাম করি না। তিনি আমাকে ডাকিতেছেন, "আয় বেটী, আয়" আমি বলিলাম, "না, আমি আর আপনার নিকট যাব না, রাগ করিয়াছি, আপনি সকল সময় কেন আমাকে দেখা দেন না। আমি একাকিনী থাকিতে মনে ভয় পাইয়া থাকি। আপনাকে কত ডাকি, আপনিত দেখা দেন না।" তিনি বলিলেন, "আমিত তোদের আপদে বিপদে তোদের সঙ্গেই থাকি, আমাকে মনে প্রাণে ডাকিলেই আমি দেখা দেই।" এই বলিয়া আমার একটী আঙ্গুল ধরিয়া নিকটে যাইতে বলিলেন, অমনি যাইয়া প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিলাম। আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি আবার প্রণাম করিয়া

কয়টী বর প্রার্থনা করিলাম। * * * আমার মন যেন সর্ব্বদা সদ্‌বিষয়ে থাকে, আমি যে সব অপরাধ করিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করিবেন।" তিনি বলিলেন, "হয়েছে, হয়েছে।" পরে আমি খোকা ও ইন্দুরাণীকে আনিয়া প্রণাম করাইলাম এবং বলিলাম, "বাবা, নারায়ণ আমাকে যে আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য দিয়াছেন আমি তাহার কত অপব্যবহার করিয়া থাকি, গালি দেই। তিনি বলিলেন, "**ওকে 'কৃষ্ণ', 'গোপাল' ব'লে গালি দিবি; ওকে নাম** শিখাইবি।" আমি বলিলাম, "কি নাম শিখাইব আমাকে বলিয়া দিন।" তিনি বলিলেন, "ওঁ............ এই নাম শিখাইবি।" আমি বলিলাম, "খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, সে যেন ভাল হয়ে চলে, সভ্য, শান্ত সাধু ভক্ত হয়।" এই কথা বলিতে না বলিতেই তিনি হাসিয়া উঠিলেন, পরে আমাকে বলিতে লাগিলেন, "কি বেটী! আমায় কিছু খাওয়াইবি না? আমার যে ক্ষিদা পেয়েছে।" তখন আমি বাল্য-ভোগের আয়োজন করিলাম,—কম্পাপানা, বেলপানা, আরও অন্যান্য ফল ও দুধ মিশ্রি দিয়া বাল্যভোগ হইল। পরে আবার ডাল তরকারী লুচি প্রভৃতি পাক করিয়া দিলাম। তিনি আমাদের ছোট ঘরে বসিয়া ভোজন করিলেন, পরে সকলে প্রসাদ পাইলেন। অন্যান্য বার ঠাকুর আসিতে আমাদের গুরু ভাইগণ আসেন, এবার কেবল তিনি একাই আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, "বাবা, আপনার সঙ্গে আমাদের গুরু-ভাইগণ নাই কেন? তিনি বলিলেন, "তুই আমাকে নির্জ্জনে আসিতে ডাকিয়াছিলি, তাই পালিয়ে এসেছি।" তিনি বিশ্রাম শয্যায় আসিয়া এসব কথা বলিলেন। ইতি ১৩২৬ সন ১৪ই বৈশাখ।

সোমেশ বসুর মৃত পত্নীর সহিত সস্ত্রীক দীক্ষা।

সোমেশ বাবু* বিহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট মধ্যে চাকুরী করিতেন। ইঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইলে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে, চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন, ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, স্ত্রীলোক মাত্রই তাঁহার নিকট মাতৃবৎ জ্ঞান হইতে লাগিল। তিনি আর বিবাহ করিবেন না। স্থির করিলেন। গুরু অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। দীক্ষার জন্য প্রবল বাসনা জন্মিয়াছে। কিন্তু মনে মনে সংকল্প করিলেন তাঁহার মৃতা স্ত্রীর সহিত যিনি দীক্ষা দিতে পারিবেন তিনি তাঁহারই নিকটে দীক্ষিত হইবেন। এই সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভারতের বহু সম্প্রদায়ের বহু সাধুর নিকট—দীক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কেহই মৃতা স্ত্রীর সহিত এক সঙ্গে দীক্ষা দিতে স্বীকার করিল না। এমন কি এরূপ একটা দীক্ষা হইতে পারে বলিয়াও কেহ বলিল না। এভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদা গোরক্ষপুরের মহাত্মা গম্ভীরানাথ বাবার আশ্রমে সন্ধ্যা সময়ে উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ রাত্রে সোমেশ বাবুকে বাবাজীর শয়ন কক্ষেই শয়নের স্থান দেওয়া হইল। ঐ রাত্রে সোমেশ বাবু গম্ভীরানাথ বাবার শোয়ার খাটের পায়া ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, আমার

---

* শ্রীসোমেশ চন্দ্র বসু,—নিবাস বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে। ইনি অঙ্ক শাস্ত্রে অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন, ১০০ ডিজিটের পূরণ, বর্গমূল, বর্গফল, কোন্ সনের কি মাসে কোন্ তারিখ ইত্যাদি মুখে মুখে মুহূর্ত্ত মধ্যে বলিয়া দিতে পারেন। ইনি ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গিয়া তথাকার পণ্ডিত সুধী মণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি এখন আমেরিকায় আছেন।

সস্ত্রীক দীক্ষা হইতে পারিবে কি না, তাহা আমাকে অদ্য রাত্রেই জানাইয়া দিন।" সোমেশ বাবুর নিদ্রা আসিল, স্বপ্নে দেখিলেন গম্ভীরানাথ সোমেশ বাবুকে বলিতেছেন, "তুই হরিদ্বার চলিয়া যা, সেখানে ভোলাগিরিজী তোকে সস্ত্রীক দীক্ষা দিবেন।" সোমেশ বাবু পরদিনই হরিদ্বার রওনা হইয়া গেলেন। হরিদ্বার স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আসিয়াছিস কেন?"

সোমেশ বাবু—আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, আমি অদীক্ষিত, আমার দীক্ষা লইতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু আমি মনে মনে সংকল্প করিয়াছি, যিনি আমার মৃতা স্ত্রীর সহিত একত্রে আমাকে দীক্ষা দিতে পারিবেন, তাঁহার নিকটই আমি দীক্ষা লইব, এই উদ্দেশ্যে বহু সাধুর নিকট গিয়াছি। কেহই দীক্ষা দিতে স্বীকার করিলেন না। যদি আপনি তাহা পারেন তবে আপনি আমাকে দীক্ষা দিন, নতুবা আমি দীক্ষা লইব না।

ঠাকুর—হাঁ, আমি তোকে সস্ত্রীক দীক্ষা দিতে পারিব। কিন্তু তুই বল, আর বিবাহ করিবি না।

সোমেশ বাবু—না, আমি নিশ্চয়ই আর বিবাহ করিব না।

ঠাকুর দীক্ষার দিন স্থির করিয়া দিলেন। দীক্ষার ঘরে তিনখানা আসন পাতা হইল। ২টী কণ্ঠী গাঁথা হইল। ঠাকুর সোমেশ বাবুকে বলিলেন, "দেখ, তুই তোর স্ত্রীকে স্পর্শ করিতে পারিবি না।" অতঃপর ঠাকুর ও সোমেশ বাবু উপবেশন করিলেন, সোমেশ বাবুর বাম পার্শ্বের আসনে তাঁহার স্ত্রী উপবেশন করিল। সস্ত্রীক দীক্ষা হইয়া গেল, ঠাকুর সোমেশ বাবুর গলায় ২টী কণ্ঠী বাঁধিয়া দিলেন এবং জপের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া দিলেন।

ঠাকুরের নাকে বয়সের সংখ্যা প্রকাশ।

সোমেশ বাবু তাঁহার আমেরিকা অবস্থান সময়ের একটা ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। তাহা এই:—তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় ২১ মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ খালি /৫০ পোয়া দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক সোমবার উপবাস করিতেন এবং মঙ্গলবার কিছু চিনাবাদাম মাত্র খাইতেন। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গুপ্তচর মনে করিয়া কেনেডায় ৪৫ দিন পর্য্যন্ত জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐ সময় কানাডায় Medical Conference হইতেছিল। ঐ Conferenceএ অন্ততঃ কি পরিমাণ খাদ্য (diet) না হইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না তাহার বিচার হয়। ঐ বিচার সভায় সোমেশ বাবুর diet (খাদ্যের) এর হিসাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। এই পরিমাণ খাদ্যে মানুষ কি করে এতদিন বাঁচিতে পারে তাহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে ঐ পরিমাণ খাদ্য খাইয়া তাহার ওজন জেলে প্রবেশের সময় অপেক্ষা ১৯ পাউণ্ড (/৯॥ সের) বৃদ্ধি হইয়াছিল। যখন তিনি জেলে আবদ্ধ ছিলেন তিনি একদিন ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, বিনা অপরাধে আমাকে জেলে পঁচাইয়া মারিতে চাও, তবে মার।" আর যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আমাকে শীঘ্র খালাস করিয়া দাও।" ঠিক ইহার পর দিনই জেলের সুপারিণ্টেডেণ্ট সোমেশ বাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাবু, শুনিয়াছি তুমি একজন উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় সাধু (A Great Indian Monk) এবং অনেক ভূত, ভবিষ্যৎ বলিতে পার। আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যদি তুমি আমার কত বয়স তাহা বলিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে যে প্রকারেই পারি জেল

হইতে খালাস করিয়া দিব। সোমেশ বাবু বলিলেন, "আমি জ্যোতিষ জানি না, কি প্রকারে আপনার বয়সের সংখ্যা বলিব?" অতঃপর সেই সাহেবটী সোমেশ বাবুকে অত্যন্ত খোসামুদি আরম্ভ করিল, সর্ব্বদা তাহার নিকটে আসিত, নানা কথা ও গল্প করিতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয়টীর জন্য বিশেষ অনুরোধ করিত। একদিকে জেল হইতে মুক্ত হইবার প্রবল বাসনা, অপরদিকে সাহেবের ঐকান্তিক অনুরোধ, নানা কারণে জড়ীভূত হইয়া সোমেশ বাবু কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে ঠাকুরের নিকট একটা বিশেষ প্রার্থনা করিবেন মনে করিয়া নিজ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং হরিদ্বারের দিকে দৃষ্টি দিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন :—"ঠাকুর, যদি আমাকে জেল হইতে খালাস করিয়া দেওয়া তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে সাহেবের বয়স জানাইয়া দেও।" প্রার্থনান্তে সোমেশ বাবু অন্ধকারে বসিয়া ঠাকুরের মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে ঠাকুরের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে নাকখানা বিশেষ-ভাবে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ক্রমে দেখিলেন নাকের একপার্শ্বে ইংরেজীতে "৬" অঙ্ক ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে নাকের অপরদিকে "৫" ফুটিয়া উঠিল। সোমেশ বাবু পরিষ্কাররূপে "৬৫" অঙ্ক দেখিতে পাইলেন। পরদিন সোমেশবাবু সাহেবকে বলিয়া দিলেন,—আপনার বয়স ৬৫ বৎসর। বাস্তবিক তাহার বয়স তখন ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। সোমেশ বাবুর উত্তর শুনিয়া সাহেবটী বিস্মিত হইয়া তাহার পায়ে পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। অতঃপর এই সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় সোমেশ বাবু জেল হইতে খালাস পাইলেন।

কুম্ভমেলায় স্বামীজী

১৩৩৩ সনের ১৮ই ফাল্গুন হইতে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভের মেলা বসিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন এই সময় প্রায় ১৫।১৬ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী, গৃহী হরিদ্বারে সমবেত হইয়াছিল। হরিদ্বার তীর্থ গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত, মিউনিসিপালিটী হইতে তিনটী অস্থায়ী কাঠের সেতু-দ্বারা গঙ্গার উভয় কূল সংযোগ করা হইয়াছিল তাহাতে উভয় তীরেই সাধু ও গৃহীগণের ছাউনি পড়িয়াছিল, ৩০শে চৈত্র শেষ স্নানের দিন নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু ফাল্গুন মাস হইতে জন-বাহুল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সময় হরিদ্বার ক্ষেত্র কি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কলি-কলুষ-নাশিনী পুণ্য-তোয়া মা ভাগীরথী কুলুকুলুনাদে তীব্র বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। উভয় তীরেই সাধু জমায়েৎ; কোথাও হোমকুণ্ড জ্বলিতেছে, কোথাও ধুনী হইতে ধুম উৎগীরণ হইতেছে, কোথাও শঙ্খ কাঁসর, ঘণ্টাধ্বনি মুখরিত আরতি কীর্ত্তন হইতেছে; সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভক্তজনপ্রদত্ত ফল-ফুল দীপ সমন্বিত পত্রের অসংখ্য টোপর গঙ্গাবক্ষ উজ্জ্বল করিয়া নাচিতে নাচিতে বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; ব্রহ্মকুণ্ড তীরে কেউ গীতা পাঠ করিতেছে, কেউ ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছে, কেউ বা গ্রন্থসাহেব অধ্যয়ন করিতেছে। কোথাও ধর্ম্ম বক্তৃতা হইতেছে, কোথাও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন চলিয়াছে। হাটিতে চলিতে বসিতে যেখানে সেখানে, ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মভাব ধর্ম্মালোচনা; সকলেই যেন সংসারের আবিলতা হইতে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য ছুটি লইয়া এস্থানে সমবেত হইয়াছেন এবং অন্তকালের শেষ সম্বল সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হরিদ্বার লালতারাবাগে স্বামীজী মহারাজের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। তদ্ব্যতীত আরও দুইটী দোতালা বড় বড় পাকা ধর্ম্মশালা আছে। ঠাকুরের আদেশ ক্রমে আশ্রমের পক্ষ হইতে গঙ্গার উভয় তীরে বহু বিস্তৃত স্থান পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত নিয়া তাঁহার চরণাশ্রিত শিষ্য ও অন্যান্য আগন্তুকগণের জন্য ছাউনি প্রস্তুত করাইয়া রাখা হইয়াছিল। জনস্রোত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, আর ঠাকুরের চরণতলে আশ্রয় পাইয়া ঐ সকল স্থান পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ধর্ম্মশালা দুইটী ভরতি হইয়া গেল। নিজ আশ্রম বাটিকা লোকে লোকারণ্য; উভয় তীরস্থিত ছাউনিগুলি পূর্ণ হইল, তবুও লোক আসিতেছে, আশ্রয়প্রার্থী হইতেছে। সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যতগুলি ট্রেইন আসিতেছে, প্রত্যেক ট্রেইন হইতেই যাত্রী আসিয়া স্থানের জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থী হইতেছে, ঠাকুরও অকাতরে অনবরত আশ্রয় দান করিতেছেন। কেহ বলিতেছে, "বাবা, আমি তোমার চরণাশ্রিত, স্থান দেও;" কেউ বলিতেছে, "আমি তোমার অমুক শিষ্যের পরিচিত, স্থান চাই;" কেউবা, 'আমি তোমার অমুক শিষ্যের অমুকের অমুক, আমার দাওয়া আছে;" কেউ বলে, "তুমি বাঙ্গালীর ঠাকুর, আমিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালীকে আশ্রয় তুমি ভিন্ন কে দিবে? আশ্রয় দাও", এভাবে কেউ বলে 'স্থান চাই', কেউ বলে 'স্থান আছে, খাওয়ার চাই', কেউ বলে 'স্থানও চাই, খাওয়াও চাই', এভাবে দিন রাত "চাওয়া" আর ফুরায় না। ঠাকুরও যে ভাবে যে যাহা চাহিতেছেন তাহাই দিতেছেন। নূতন স্থান বন্দোবস্ত হইল, ক্রমে তাহাও পূর্ণ হইয়া গেল। আশ্রমে অন্নছত্রের মহোৎসব চলিতেছে, প্রত্যহ গড়ে ১০০০।১২০০ শত লোক প্রসাদ পাইতেছে, ডাল ভাত রুটী তরকারী, খিচুড়ি মাঝে মাঝে লাড্ডু, মালপোয়া, দই, মিষ্টান্ন চলিতেছে। যাহার যাহা অভিরুচি, তাহাই পাইতেছে,

ঠাকুরের আদেশ ও কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের সুশৃঙ্খলায় দিনে ১২টা, ১টা ও রাত্রে ১০।১১ টার মধ্যে সমস্ত ভোজন ব্যাপার সুনির্ব্বাহ হইয়া যাইতেছে, এভাবে এক মাস চলিয়াছে, মধ্যাহ্নে আহারান্তে আশ্রমে কোথাও সৎ-প্রসঙ্গ হইতেছে, কোথাও গীতা অধ্যয়ন হইতেছে। অপরাহ্ণে ঠাকুর, ব্রহ্মকুণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণে বাহির হন। বেড়াইবার সময়টা বৃথা যায় অথবা সঙ্গীয় ভক্তগণের মধ্যে বাজে গল্পের সুযোগ ঘটে, তজ্জন্য ঠাকুরের আদেশে সঙ্গীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ভগবৎ-স্তোত্র গীত হইতে থাকে। যে পথে ঠাকুর চলিতে থাকেন ঠাকুরের রূপে তাহা যেন ঝলসিয়া উঠে,—স্তোত্র ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া পড়ে। নিশাকালে প্রজ্বলিত দীপ-শিখা দর্শনে পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় পথিপার্শ্বস্থ জনগণ ঠাকুরের অমানুসিক রূপ জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া মুগ্ধবৎ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতেছে। উজ্জ্বল-দ্যোতি-রেশমি-গৌরিক-ভূষণে-ভূষিত, সুগন্ধ-শ্বেত-চন্দন-চর্চ্চিত, তপ্ত কাঞ্চন কান্তি শ্রীঠাকুরের মনোহর কলেবরটী যখন জন-বাহুল্য অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকিত তখন মনে হইত, স্নিগ্ধ-প্রভা-প্রদীপ্ত, সর্ব্বজন পূজ্য নয়নাভিরাম স্বয়ং অরুণ-দেব বুঝি বিমান বিহার পরিত্যাগ করিয়া উষার দিগ্-মণ্ডল উদ্ভাসিত করতঃ ক্ষিতিতলে বিচরণ করিতেছেন, হর্ষোৎফুল্ল জন-গণ কেবলি দেখিতেছে—কেবলি দেখিতেছে; চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহাদের নির্নিমেষ লোচনের স্থির দৃষ্টি ঠাকুরের শ্রীমুখের উপর পড়িয়া আছে; কেহ বা মন্ত্র-মুগ্ধবৎ আকর্ষিত হইয়া জন-সংঙ্ঘ উপেক্ষা করতঃ শ্রীচরণে লুটিয়া পড়িতেছে। কেহবা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ফুল-বিল্ব-পত্র শ্রীপাদ-পদ্মে অঞ্জলি ঢালিয়া দিতেছে; যাহারা একটু দূরে দাঁড়াইল—তাহারা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এই সৌন্দর্য্য সুধা অকাতরে পান করিতেছে, আর ভাবিতেছে—অত বার্দ্ধক্যে এহেন রূপ-লাবণ্য কি মনুষ্য-দেহে

সম্ভব? একদিন ঠাকুর বিশ্বেশ্বর শিবের বাড়ী চলিয়াছেন, শিষ্য-মণ্ডলী ভগবৎস্তোত্র গান করিতে করিতে ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন, পথ চলিবার সময় যে ভাবে লোক ঠাকুরের চরণে পতিত হয় তাহাতে পথ চলা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। পথে যেন পায় পড়িয়া ঠাকুরকে প্রণাম করা না হয়—তজ্জন্য ভক্তগণ বিশেষ সাবধান হইয়া চলিয়াছেন। কতকগুলি স্ত্রীলোক বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন, একে দেব-বাঞ্ছিত কামজয়ী ঠাকুরের রূপ, তাহাতে গৈরিক-রেশমি ভূষণোপরি লহরী-যুক্ত সদ্য-স্ফুট সৌরভ-মণ্ডিত কুসুম-মাল্যাভরণ; ততোধিক ভগবন্নামোল্লসিত শ্রীমুখের অট্টহাসি, ঠিক যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের এক জীবন্তমূর্ত্তি চলিয়া যাইতেছে। স্ত্রীলোকগুলি শিষ্যগণের বাধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ফুল-বিল্ব-পত্র হস্তে দৌড়িয়া আসিল। কেহ শ্রীপাদপদ্মে, কেহ শ্রীঅঙ্গে, কেহ বা মস্তকে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। তাহাদের ব্যাকুলতা দর্শনে কেহই তাহাদিগকে বাধা দিতে সাহস করিল না। ঠাকুর হাসিমুখে তাহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

চারি ঘণ্টায় বসন্ত উধাও।

বাবু পার্ব্বতীচরণ দাসগুপ্ত লক্ষ্মীপুরের (নোয়াখালী) একজন ডাক্তার। ১৩৩৩ সনের হরিদ্বার কুম্ভে যাওয়ার মনস্থ করিয়া লক্ষ্মীপুর হইতে তাঁহার নিজ বাটী ভারুকাঠি (বরিশাল) রওনা হইয়াছেন; বরিশাল পৌঁছিয়াই তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়া পড়ে। প্রায় ১০৪—৫ ডিগ্রি জ্বর লইয়া বাড়ী পৌঁছিলেন এবং ৪ দিন প্রবল জ্বরে ভোগিয়া ৪র্থ দিনে দুরন্ত

বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ মাথা ও মুখ বসন্তে ছাইয়া গিয়াছে। সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন ; পার্ব্বতী বাবুর মৃত্যুর ভয় যত নয়, হরিদ্বার কুম্ভে যাইতে না পারার দুঃখ তদপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে প্রবল জ্বর, তদুপরি বসন্তের ভীষণ বেদনা, তাঁহাকে একান্ত কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। সামান্য শঠীর পালো পথ্য, তাহাও গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছেন না। এসব আদি ভৌতিক যন্ত্রণা তবুও সহ্য হইতেছে, কিন্তু কুম্ভে যাইতে পারিবেন না বলিয়া যে মনস্তাপ, অন্তরজ্বালা, তাহা আর সহ্য হইতেছে না। সময় সময় গলায় ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যা করিতেও প্রবল উত্তেজনা আসিতেছে। বসন্ত দেখা দেওয়ার তৃতীয় দিবস প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা আসিল, তিনি মনে মনে ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন :—"ঠাকুর ! কত যন্ত্রণাইত সহ্য করিয়াছি, করিতেছি ; এখন এমন শক্তি দেও যে, কুম্ভে যাওয়ার অসমর্থতা হেতু যে জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যেন সহ্য করিতে পারি......ইত্যাদি।" এভাবে কাতর প্রার্থনা অন্তে তাঁহার প্রবল নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কয়দিন ব্যথা বেদনায় জ্বালা যন্ত্রণায় একরূপ ঘুম হয় নাই বলিলেই হয়। আজ হঠাৎ আপনা হইতেই চ'খ বুজিয়া আসিল। তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। প্রায় ৪ ঘণ্টা গাঢ় নিদ্রার পর হঠাৎ কোন শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। জাগিয়াই ভাবছেন একি! তিনি কি ছিলেন, কি হইয়াছেন। কোথায় ছিলেন, কোথায় আসিয়াছেন, একি স্বপ্ন না জাগরণ! প্রবল জ্বর ও বসন্ত জনিত তীব্র জ্বালা যন্ত্রণার ব্যথা বেদনায় শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন যে দেহযন্ত্র লইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন এখন সে সব উদ্বেগ গেল কোথায়? যে দেহ ব্যাধি-ভারাক্রান্ত ছিল, তাহা পালকের ন্যায় হালকা হইয়া পড়িয়াছে। যেন পুরাতন

দেহের বিনিময়ে এক শান্তিপূর্ণ নবকলেবর আসিয়া পড়িয়াছে। এ আবার কি! মাথায় হাত দিলেন, মুখে হাত দিলেন; এ যে শ্লেটের মত মসৃণ। যাহা বসন্তের গোটায় ভরপুর ছিল তাহা দেখি চারি ঘণ্টার মধ্যে সব মরিয়া একেবারে মিলিয়া গিয়াছে। বসন্ত বলিয়া যে কোন জিনিস ছিল তাহার চিহ্নটীও নাই। একেবারে খালাস! পার্ব্বতী বাবু দশ হাতির বলে "জয় গুরু" বলিয়া চীৎকার দিয়া লাফাইয়া উঠিলেন; তখন রাত্র ৩।৪টা মাত্র বাজিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী এবং বড় ভ্রাতৃবধূ বিছানায় নিদ্রিত ছিলেন; পার্ব্বতী বাবু আনন্দে অধীর হইয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিলেন এবং ভ্রাতৃবধূকে তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার জন্য রান্না করিতে হুকুম দিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষটীর ন্যায় স্নান করিবার জন্য পুকুরের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য্য উঠিল। পার্ব্বতী বাবু আহারে বসিলেন। যে রোগী আজ ৭।৮ দিন ধরিয়া প্রবল জ্বর ও বসন্তের আক্রমণে একরূপ বে-হুস ছিলেন, সামান্য একটু শঠীর পালো পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ ছিলেন, আজ চারি ঘণ্টার নিদ্রান্তে সম্পূর্ণ সুস্থ, ভাল মানুষটীর মত গলাজলে অবগাহন করিয়া ভোজনে বসিয়াছেন! ডাল, ভাত, তরকারী সহযোগে প্রচুর পরিমাণে উদর-যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। এখনই একেবারে হরিদ্বারের দিকে চম্পট দিতে হইবে। ভারুকাটী হইতে বানরীপাড়া ষ্টীমার ষ্টেশন ৪ মাইল দূরে, ঠিক সবল সুস্থ যুবকটীর মত পদব্রজেই ষ্টেশনে পৌঁছিলেন এবং চতুর্থ দিবসে হরিদ্বার গিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করিলেন।

সদ্‌গুরু সদা জাগ্রত।

পার্ব্বতী বাবু এ যাত্রায় হরিদ্বার গিয়া ৬ মাস তথায় ছিলেন, রাত্রে ঘরের বাহিরে খোলা জায়গায় যে স্থানে ঠাকুর খাটিয়া ফেলিয়া শয়ন করিতেন, পার্ব্বতী বাবু ঐ খাটিয়ার নিকট ফরাস বিছানায় কম্বল মুড়িয়া শুইতেন। রাত্রি ১২ টার পর উঠিয়া সারারাত্রি "নাম" করিয়া কাটাইতেন। এই সময় মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসিয়া তাঁহাকে ঝিমাইয়া ফেলিত। যেই মুহূর্ত্তে তিনি নাম ফেলিয়া তন্দ্রাবশে ঝিমাইতে আরম্ভ করিতেন, তখনি ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে গভীর স্বরে এমন ভাবে ওঁকার ধ্বনি উচ্চারিত হইত যে, পার্ব্বতী বাবু তৎক্ষণাৎ চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিতেন এবং পুনরায় নাম করিতে আরম্ভ করিতেন। ঠাকুর খাটিয়ার উপর কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন, আলো নির্ব্বাপিত, চতুর্দ্দিক অন্ধকার; পার্ব্বতী বাবু এক ঘুম দিয়া অলক্ষিতে অন্ধকারে উঠিয়া বসিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিতেন। এই অবস্থায় যে মুহূর্ত্তে ঝিমানি আসিত ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অন্ধকারে কম্বল ঢাকা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে ওঁকার ধ্বনি উত্থিত হইত। এভাবে একদিন নয়, দুই দিন নয়, ঐ ছয়মাস ধরিয়া প্রতিরাত্রে যতবার তাঁহার ঝিমানি আসিত ঠিক ততবারই ঐ ধ্বনি উঠিয়া তাঁহাকে সচকিত করিয়া দিত।

কুম্ভ স্নানান্তে ঠাকুরের জ্বর।

১৩৩৩ সনের কুম্ভ স্নানের পর ঠাকুরের জ্বর হইয়াছিল, তাহাতে একজন বলিল, "বাবা, আপনার যে জ্বর হইল দেখিতেছি।" তদুত্তরে ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এত লোকের পাপ নিলাম তবুও জ্বর হবে না?"

আশ্রিত-বাৎসল্য।

১৩৩৫ সনের কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে হরিদ্বার হইতে কুরুক্ষেত্র স্নানে যাওয়ার কথা চলিতেছে। ঠাকুর কোন্ দিন কখন কুরুক্ষেত্র রওনা হইবেন তাহা জানিবার জন্য নানাস্থান হইতে টেলিগ্রাম আসিতেছে, ঠাকুর কাহাকেও যাত্রার দিনের কথা বলিতেছেন না। তিনি সাধারণতঃ রওনা হওয়ার অল্প পূর্ব্ব ব্যতীত কখনও ঠিক সময় কাহাকেও বলেন না। কুরুক্ষেত্রে রায় লালা গঙ্গারাম রায় বাহাদুর এম, এল, সি, তাঁহার ও সঙ্গীয় লোকজনের থাকার ভার নিয়াছেন। কোন্ দিন কোন্ সময় হরিদ্বার হইতে রওনা হইবেন এবং কখন কুরুক্ষেত্র পৌছিবেন তাহা টেলিগ্রাম করিয়া জানাইবার জন্য রায় বাহাদুর পূর্ব্বেই বিশেষ অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কিন্তু কোন টেলিগ্রামই করিতেছেন না। যে দিন প্রাতে রওনা হইবেন ঠিক তৎপূর্ব্বে সন্ধ্যায় যাওয়ার কথা সকলকে বলিলেন। রায় বাহাদুরের নিকট টেলিগ্রাম করার কথা বলা হইলে বলিলেন, "দেখ, টেলিগ্রাম করিলে কি হইবে জানিস্? একখানা মটর নিয়ে গঙ্গারাম ষ্টেশনে হাজির হবে, আর জামাইবাবুটীর মত আমাকে লইয়া ছুট দিবে, সঙ্গের লোকজন আসবাবপত্র সব প'ড়ে রবে; আমাকে নিয়াই সকল ব্যস্ত থাকবে, আর কাহাকেও কেহ জিজ্ঞাসা করার ধার ধারিবে না। টেলিগ্রাম করিয়া কাজ নাই, আমি চুপি চুপি সকলকে লইয়া তার তাঁবুতে উপস্থিত হইব।"......... বাস্তবিকই কোন টেলিগ্রাম করা হইল না। কুরুক্ষেত্র ষ্টেশনে পৌছিয়া ঠাকুর নিজেই লাঠি হাতে ষ্টেশনের বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সোয়া শত বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও ঠিক যুবকটীর মত দ্রুত অগ্রসর হইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া রায় বাহাদুরের কেম্পে উপস্থিত হইলেন।

দেশ, কাল, পাত্রের সুযোগ ছাড়া উচিত নহে।

কুরুক্ষেত্রে অদ্য একাদশী তিথি, ঠাকুর প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, আসিতে প্রায় ১১টা বাজিল। ইতিমধ্যে অনেকেই গুরু পূজা না করিয়া আহার করিয়া ফেলিয়াছে। ঠাকুর ফিরিয়া আসার পর শিষ্যগণ পূজা ও প্রণাম করিতে আসিলেন। ঠাকুরের নিকট কাহারও লুকোচুরি খেলিবার সাধ্য নাই। যাহারা খাইয়া প্রণাম করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে বলিলেন, "কিরে, বুঝি খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছিস, তোদের কাজ সব লোক দেখান।" যাহারা প্রণাম করিয়া কিছু প্রণামি দিলেন না তাহাদিগকে, নিজ পুত্রের হিতার্থে পিতা যেমন বলিয়া থাকেন সে ভাবে বলিলেন, "দেখ, আজ একাদশী তিথি, কুরুক্ষেত্রের মত স্থান, গুরু উপস্থিত ; দেশ, কাল, পাত্র, সকল সুযোগই মিলিয়াছে, দানের ইহাই উত্তম সময়, এ সময় খালি হাতে গুরু প্রণাম করা ঠিক নহে।"

কুরুক্ষেত্র স্নান।

১৩৩৫ সনের কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে এক বিরাট মেলা হইয়াছিল, প্রায় দ্বিতীয় কুম্ভের অভিনয় হইয়াছিল। অনেকে বলেন, এই সময় ১২।১৪ লক্ষ লোক কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। আজ সূর্য্যগ্রহণ, কুরুক্ষেত্র স্নানের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য্যগ্রহণের দিন তাঁহাকে যেন কোন প্রণামী দেওয়া না হয়। বিতরণের জন্য যে সমস্ত কাপড় কম্বলাদি ঠাকুরকে দেওয়া

হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বদিনই সব বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল, ঐ স্থানে দুইটী হ্রদ আছে, একটী পূর্ব্বদিকে—উত্তর-দক্ষিণ লম্বা, অপরটী দক্ষিণদিকে—পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা; প্রথমটী অপেক্ষাকৃত ছোট। কোন্‌টীতে স্নান করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে অনেক মতানৈক্য থাকায় ঠাকুর প্রথমটীতেই আমাদিগকে স্নান করার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। ঠিক স্পর্শ সময়ই স্নানের বিধি; তজ্জন্য সর্ব্বত্রই ব্যস্ততার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; কেহ উর্দ্ধনেত্র হইয়া সূর্য্য দেখিতেছে, কেহ বা অধোশির হইয়া জলে গ্রহণ লক্ষ্য করিতেছে, কেহ ঘড়ি ধরিয়া আছে। ঠাকুর ধীরে ধীরে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া স্নানযাত্রা করিলেন, সঙ্গে স্নানের বেশে গামছা স্কন্ধে মালকোচা মারা সব শিষ্যমণ্ডলী ঠাকুরের সাথে চলিয়াছে। আজ তাহাদের প্রাণে যে কি অপার আনন্দ তাহার তুলনা নাই; যাঁহার পদরজ স্পর্শে তীর্থ পবিত্রীকৃত হয়, গঙ্গা যমুনা বিগত-কলুষা হয়, আজ সর্ব্ব-বিঘ্ন-হারী সেই সদ্‌গুরু সঙ্গে, স্নানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ, কাল—সূর্য্যগ্রহণ, স্থান—কুরুক্ষেত্র, স্নান—দ্বৈপায়ন হ্রদে, তাহাই করিতে চলিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে ভগবৎ-স্তোত্র গান করিতে করিতে গুরু-ভ্রাতাগণ ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছেন। যে যাহা পারিতেছে, চতুর্দ্দিকে, সিকি, দুয়ানী, টাকা, পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। ক্রমে দ্বৈপায়ন হ্রদের ঘাটে গুরু-ভ্রাতাভগ্নীগণ সহ ঠাকুর উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের অঙ্গাবরণ ও বহির্ব্বাস খুলিয়া ফেলা হইল; মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ঠাকুরের দেহ জ্যোতিঃ বাহির হইয়া পড়িল। স্নানার্থী পুরুষ রমণী এই অলোকসামান্য রূপ-শোভা দর্শনে যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিতেছে, বুঝি স্বর্গের কোন দেবতা গ্রহণ-স্নান করিবার জন্য সাধুবেশ ধারণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছেন।

ঠাকুর দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুব দিতেছেন,—মনে হইতেছে যেন প্রদোষের প্রশান্ত প্রভাকর গঙ্গা সাগরের পশ্চিম প্রান্তে অবগাহন করিতেছে। ঠাকুরের সহিত গুরু-ভ্রাতাভগ্নীগণ স্পর্শ-স্নান করিতে করিতে আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছেন। আজ যেন ঠাকুর তাঁহার পদোদক দ্বারা তাহাদের বহুদিন সঞ্চিত কলুষ-রাশি দ্বৈপায়ন হ্রদে বিধৌত করিয়া দিলেন। স্নানান্তে হিসাব করিয়া দেখা গেল ঠাকুর বাসা হইতে ধীরে ধীরে রওনা হইয়া যে সময় স্নানে নামিয়াছেন ঠিক ঐ সময়েই সূর্য্যে রাহু স্পর্শ হইয়াছিল।

অসময়ে কিছু হয় না।

(পার্ব্বতী বাবুর জীবনে ঠাকুরের কৃপারহস্য)

বাবু পার্ব্বতীচরণ দাশ গুপ্ত লক্ষ্মীপুরের (নোয়াখালী) একজন ডাক্তার। পাঠ্যাবস্থা হইতেই সংসারের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে। যখন তাঁহার বয়স সবেমাত্র ১৭।১৮ বৎসর, তখন হইতেই তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল :—'কি করিলে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে, ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে।' এ সব চিন্তা মনে উঠিয়া তাঁহাকে এতদূর ব্যতিব্যস্ত করিয়া উঠাইল যে বাঙ্গালা ১২৯৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি কলিকাতা ৺কালীঘাটে মা কালীর মন্দিরে ধন্না দিতে সংকল্প করিলেন, কিন্তু মন্দিরের মালিক হালদার বাবুগণ তাঁহাকে বাধা দেওয়ায় তিনি নকুলেশ্বর শিবের বাড়ীতে উপস্থিত হন। এ সময় শুধু গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়া ৭ দিন অতিবাহিত করিলেন। অষ্টম দিবস রাত্র অনুমান ১১৷১২টার সময় দেখিতে পাইলেন,

মাথায় পাগড়ী বাঁধা গেরুয়া বসনধারী তিনজন সন্ন্যাসী "হর হর বম্ বম্" ধ্বনি করিতে করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং শিব-পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি সাধুগণকে পরিষ্কাররূপে তথাকার গ্যাসের আলোতে দেখিতে পাইলেন। ঐ তিন জনের মধ্যের জন পূজা অন্তে "ইও বাচ্চা প্রসাদ লও" এই বলিয়া পার্ব্বতী বাবুকে একটা গোলাকৃতি মিষ্ট প্রসাদ (*) দিলেন। তিনি অনশন ব্রত ভুলিয়া গিয়া সাধুর প্রদত্ত প্রসাদ খাইয়া ফেলিলেন। খাইয়াই মনে হইল তিনি ত সাধুগণকে প্রণাম করেন নাই। এই কথা মনে হওয়া মাত্রই নিকটস্থ কলের জলে হাত ধুইতে গেলেন। নকুলেশ্বরের মন্দিরের চতুর্দ্দিক খোলা, জলের কলও মন্দিরের অতি নিকটবর্ত্তী এবং তাহা হইতে মন্দির স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। তিনি কলের নিকট গিয়াই ফিরিয়া দেখেন মন্দিরে সাধুগণ নাই। এক মিনিটেরও কম সময় মধ্যে সাধুগণ কোথায় গেলেন, তজ্জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকের রাস্তা, গল্লী ইত্যাদি গ্যাসের আলোকে আলোকিত, কিন্তু বহুক্ষণ যত্রতত্র দৌড়াদৌড়ি করিয়াও তাঁহাদের খোঁজ পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে রাত্র শেষ হইয়া ভোর হইতে চলিয়াছে, এমন সময় একটী কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি স্পষ্ট শুনিলেন, "এখনও সময় হয় নাই, মাকে কষ্ট দিয়া কিছুই ফললাভ হইবে না, ঘরে ফিরিয়া যাও।" এই দৈববাণী শুনিয়া তাঁহার দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। অতঃপর তিনি লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালী) আসিয়া ডাক্তারী

* এই গোলাকৃতি মিঠা প্রসাদ তিনি তখন চিনিতে পারেন নাই। বহু অনুসন্ধান করিয়াও উহা কি জিনিস তাহা জানিতে পারেন নাই। অবশেষে ২২ বৎসর পরে হরিদ্বার কুম্ভে (১৩২০।২১ সনে) গিয়া ঐ জিনিস যে লাড্ডু তাহা প্রথম অবগত হন।

করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার প্রায় ৮ বৎসর পর বাং ১৩০৬ সনে তিনি একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেন। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি চলিতে চলিতে কোন এক স্থানে একটী মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, তথায় তাঁহার উপাস্য দেবতা সম্মুখে উপস্থিত; তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতিতে ঘর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবতার পায়ের নীচে লিখা—"ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়।" এবং তন্নিম্নে লিখা আছে—"গুরুগণ কহেন নাম কর সার।" তিনি পরিষ্কাররূপে এসব দেখিতেছেন, ঠিক এমন সময় তথায় এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "নাম কর।" অতঃপর ঐ মহাপুরুষ অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাঁহাকে বলিলেন, "এই পথে সোজা চল।" এই স্বপ্ন দেখার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩০৮ সনে আবার তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য একান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। শেষে ডাক্তারী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইলেন, সেখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ধন্না দিতে অসমর্থ হইয়া একমাত্র পরণের একখানা কাপড় মাত্র সম্বল করিয়া পদব্রজে বিন্ধ্যাচলের দিকে চলিতে লাগিলেন। পথে চুণার ষ্টেশনের নিকট এক পাহাড়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় কিছু দিন অবস্থান করিলেন। এই চুণার পাহাড়ে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে পড়িয়া আছেন, এমন অবস্থায় একদিন হঠাৎ একটী রাখাল বালক আসিয়া আশ্চর্য্যরূপে তাঁহাকে জলপান করাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া গেল। অতঃপর ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ স্থানের নিকট একটু নিভৃত স্থানে এক মহাবিষ্ণুর মন্দির দেখিতে পাইলেন। একমাত্র অঞ্জলীভরা গঙ্গাজল সম্বল করিয়া ঐ মন্দিরের বারিন্দায় ১৪ দিন পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিলেন। পঞ্চদশ দিবসে শেষ রাত্রে যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, তখন

সেই পূর্ব্ব-পরিচিত কণ্ঠস্বর পুনঃ শ্রুতিগোচর হইল। ১০ বৎসর পূর্ব্বে নকুলেশ্বরের বাটীতে যে ভাবে যে স্বরে যে ভাষায় একটা অশরীরী বাণী শুনিয়াছিলেন, আজিও তাহাই শুনিলেন। শুনিলেন, "এখনও সময় হয় নাই, মাকে কষ্ট দিয়া কোন ফল নাই, ঘরে ফিরিয়া যাও।" বলা বাহুল্য, তখনও তাঁহার মা জীবিত ছিলেন এবং পুত্রের সংসার ত্যাগে অত্যন্ত শোকাতুরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। দৈববাণীর আদেশ শুনা মাত্র তাঁহার নেশা কাটিয়া গেল। আবার বাড়ীর পানে ফিরিলেন, লক্ষ্মীপুর আসিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবসায় করিতে লাগিলেন।

এভাবে প্রায় ৫ বৎসর কাটিয়া গেল। তিনি প্রাণে কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না; পিঞ্জরাবদ্ধ অপোষ পাখীটির মত কেবলই ছুটাছুটি করিতেছেন। অবশেষে ১৩১৩ সনে লক্ষ্মীপুরস্থিত ডাক্তারী ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্ত আসবাব পত্র বিক্রয় করিয়া দৃঢ়সংকল্প করিলেন, আর দেশে থাকিবেন না, যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। একা ৺কাশী আসিয়া পরিচিত কাহাকেও কিছু বলিলেন না, বা দেখা দিলেন না। কোন বাসায় না উঠিয়া একেবারে মনিকর্ণিকার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ববৎ গঙ্গাজল সম্বল করিয়া মনিকর্ণিকার ঘাটে ৮ দিন পড়িয়া রহিলেন। নবম দিন রাত্রে হঠাৎ তাঁহার মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল। বারবার—তিনবার পর্য্যন্ত সংসার ছাড়িলেন, এত অনশন ক্লেশ ভোগ করিলেন, তবুও কিছু হইতেছে না। এসব নানা চিন্তা উদয় হওয়ায় তিনি গঙ্গায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে সংকল্প করিলেন। ক্রমে বস্ত্রাদি সামলাইয়া জলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যে মুহূর্ত্তে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন তখনই মনের ভিতর হইতে একটা ধ্বনি উঠিল, "আত্মহত্যা মহাপাপ, মরিয়া ফল কি?" একথা মনে জাগিবা মাত্র তিনি স্থির হইয়া আত্মসংযম করিলেন। আজ নয় দিন ধরিয়া গঙ্গাজলমাত্র

পান করিয়া আছেন, ক্ষণেকের জন্যও ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই হঠাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন রাত্র ২টা হইবে। এ সময় কোথায় যাবেন, কি পাবেন, কি খাবেন, তজ্জন্য প্রাণ ছুটাছুটি করিতেছে। ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই একজন মাড়োয়ারী লোক তাঁহাকে প্রচুর গরম গরম লুচি, তরকারী পেঁড়া দিয়া গেল। তিনি প্রাণ ভরিয়া তাহা উপভোগ করিলেন। অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গাবারি পান করতঃ ঐ ঘাটে শুইয়া রহিলেন। রাত্র শেষ হইয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। আবার সেই দৈববাণী, অবিকল সেই কণ্ঠস্বর, সেই নিরাশার ধ্বনি। এবার শুধু উপদেশ নহে, একেবারে কড়া হুকুম—"এখন কিছুই হইবে না, শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া যাও।" ধ্বনি শুনিয়া বাড়ী যাওয়ার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দেশে ফিরিলেন, সংসার কার্য্য আরম্ভ হইল, বিবাহ করিলেন, আবার ডাক্তারী ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন, কুল-গুরু হইতে দীক্ষা লইয়া সাধন ভজন সোৎসাহে করিতে আরম্ভ করিলেন।

এভাবে ৬ বৎসর লক্ষ্মীপুর থাকিয়া ব্যবসায় করিতেছেন। বাং ১৩১৯ সনে স্বামীজী মহারাজ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়াছেন। পার্ব্বতী বাবু পরম্পর এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তথায় রওনা হইয়া গেলেন। মিরসরাই ষ্টেশনে নামিয়া কোথায় যাইবেন ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় একটী লোক আসিয়া তাঁহাকে একেবারে হেমবাবুর বাড়ী লইয়া গেলেন। পথে চলিতে চলিতে একটী বিষয় নিয়া তাঁহার মনে বড়ই তোলপাড় চলিতেছিল। বর্ষাকালিন গ্রাম্য পথ অতিক্রম হেতু পদদ্বয় কর্দ্দমাক্ত থাকা সত্ত্বেও তাহা ধুইবার অবসর হইল না; মন্ত্রমুগ্ধবৎ একেবারে স্বামীজী মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলেন তিনি পথে পথে যে বিষয়টী নিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন

ঠিক সেই বিষয়টীরই উত্তর বলিতেছেন। মনে হইল যেন তাঁহার কৃত প্রশ্নোত্তরেই স্বামীজী তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া ঐ সব কথা বলিতেছিলেন। এই ভাবে তাঁহার মনোগত প্রশ্নের উত্তর পাইয়া হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগরিত হইয়া উঠিল। ২১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে (১২৯৮—১৩১৯ সন) পর পর তিনবার যে, একই কণ্ঠস্বর, তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, অনশন ব্রতের ক্লেশ তীব্র হইয়া উঠিলেই যে দৈববাণী স্নেহব্যঞ্জক স্বরে, "সময় হয় নাই—বাড়ী ফিরিয়া যাও" বলিয়া উপদেশ দিত, মনিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গাগর্ভে লাফাইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিবার সংকল্প হইতে বিরত হইলে যে অশরীরী বাণী তাঁহাকে দেশে ফিরিবার জন্য কড়া আদেশ করিয়াছিলেন, আজ দেখি অবিকল সেই কণ্ঠস্বর, সেই সে দৈববাণীর অবিকৃত সুর! আবার মনে পড়িল—এই ত সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর! এই যে স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ! ১২৯৮ সনের কালীঘাট নকুলেশ্বরের বাড়ীতে জাগ্রত অবস্থায় রাত্র ২টার সময় "ইও বাচ্চা, প্রসাদ লাও" বলিয়া যে সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে লাড্ডু দিয়াছিলেন, আবার ১৩০৬ সনে স্বপ্নাবস্থায় যে মহাপুরুষ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ দেখি ঠিক ঠিক সেই জিনিস, সেই চেহারা, সেই পোষাক, সেই মুখ! পার্ব্বতী বাবু আর কথা বলিতে পারিলেন না, মুহূর্ত্ত মধ্যে হত-চৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন; ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল।

পরদিন তাঁহার দীক্ষার আদেশ হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি দীক্ষা গৃহে প্রবেশ করিলেন, এ আবার কি দেখিতেছেন? এই যে সে স্বপ্নদৃষ্ট মন্দির! এই যে সে দুয়ার! অবিকল সিঁড়ির ধাপগুলি! ১৩ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নদৃষ্ট মন্দিরের ভিতর সেই যে লেখাগুলি ঠিক ঠিক লিখিত রহিয়াছে,—"ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়", "গুরুগণ কহেন নাম

কর সার।” পার্ব্বতী বাবু জয়গুরু বলিয়া ঠাকুরের চরণে লুটিয়া পড়িলেন। নকুলেশ্বরের মন্দিরে ২১ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম দৃষ্ট সেই প্রসাদদাতা সন্ন্যাসী ঠাকুর, সেই অশরীরী বাণীর শরীর, সেই পুনঃ পুনঃ দৈববাণীর দেবতা, সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ, আজ প্রত্যক্ষভাবে, সত্য সত্যই তাঁহার সম্মুখে বসিয়া দীক্ষা মন্ত্রে তাঁহার জীবন ধন্য করিলেন।

গর্ব্বের মাথায় কসাঘাত।

১৩৩৫ সনে ফাল্গুন মাসে ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত অসুস্থ, তাই নানা স্থানে ঘুরিতে পারেন না। শিলেট হইতে কুমিল্লা ও চাঁদপুর হইয়া ৺শিবচতুর্দ্দশীর সময় বাজিতপুর যাইবেন স্থির হইয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও লামচর আনা গেল না। ১৯।২০শে ফাল্গুন ঠাকুর কুমিল্লা আসিবেন, এসংবাদ পাওয়া গেল। লেখকের নিজ পরিবারের ২টী পুত্রবধূর দীক্ষা হয় নাই। বড় দাদা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী উহাদিগকে কুমিল্লা পাঠাইবেন স্থির করিয়া সোনাপুর মটর রিজার্ভ করিয়াছেন, পরদিন ১৯শে ফাল্গুন রবিবার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ের সঙ্গে বধূদ্বয়কে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি ১৮ই ফাল্গুন শনিবার লক্ষ্মীপুর হইতে বাড়ী গিয়া পৌছিবা মাত্র বড় দাদার মুখে বধূদিগকে কুমিল্লা পাঠাইবার বন্দোবস্তের কথা শুনিলাম। ঐ কথা শুনা মাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, আমার সঙ্গে আলোচনা না করিয়া ছেলেমানুষ বিনয়ের সঙ্গে বধূদ্বয়কে কুমিল্লা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা বড় দাদার পক্ষে সমীচীন হয় নাই। বিশেষতঃ আমারও দুইটী ছোট ছেলের দীক্ষার বাকী, তাহাদেরও যাওয়ার দরকার,—ইত্যাদি চিন্তা করিয়া,মনে ভারি অশান্তি উপস্থিত হইল। মনে মনে একটু গর্ব্বের ভাবও হইল,—আমি

থাকিতে আবার বিনয় কেন? আমিই তাহাদিগকে লইয়া যাইব ইত্যাদি। এসব নানা চিন্তায় আত্মহারা হইয়া দাদাকে গর্ব্বিত ভাবে ২।৪ কথা বলিলাম। তিনি আমার হাবভাব দেখিয়া মটর ফেরৎ দিতে চলিয়া গেলেন।

বড়দাদা মটর ফেরৎ দিতে রওনা হইয়া যাওয়ার পর হইতে আমার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সগর্ব্ব বাক্যোচ্চারণ করিয়া যে ভাবে মটর ফেরৎ দেওয়ার অভিনয় করিলাম তাহাতে কি জানি কি অনর্থ ঘটিয়া বসে। নানা দুশ্চিন্তায় খুব ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

কি যেন একটা অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মন ভার বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ বড় দাদার কথা ও কার্য্যের উপর এভাবে কোন দিনও প্রতিবাদ করি নাই। যাহা হউক মটর ফেরৎ দেওয়া হইল। আমার মতানুযায়ী সব ঠিক করিয়া ২২শে ফাল্গুন পুনরায় মটর রিজার্ভ করিয়া সকলকে লইয়া, সোনাইমুড়ী ষ্টেশনে পৌঁছছিলাম। ঠাকুর কুমিল্লা আছেন কি চাঁদপুর গিয়াছেন জানিতে না পারায় কোথাকার টিকিট করিব স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময় কতিপয় গুরু-ভ্রাতার মুখে শুনিলাম ঠাকুর ঐদিন ৩টার গাড়ীতে চাঁদপুর চলিয়া গিয়াছেন। চাঁদপুরের টিকিট করিয়া রওনা হইলাম, মনে করিলাম চাঁদপুর শ্রীমত্তিগণের দীক্ষাকার্য্য সমাধা করাইয়া তথাকার ডাক্তার বাবু যোগেশচন্দ্র শূরের বাসায় তাহাদিগকে রাখিয়া আমি একাই ঠাকুরের সঙ্গে বাজিতপুর যাইব। কিন্তু সংবাদ পাইলাম ঠাকুর চাঁদপুর নামেন নাই, একেবারে ষ্টীমারে উঠিয়াছেন। একথা শুনিয়া বিপদ গণিতে লাগিলাম। যা'হউক আমিও চাঁদপুর না থামিয়া একেবারে ষ্টীমারে গিয়া উঠিলাম। তখন রাত্রি ২টা; ষ্টীমারে উঠিয়া দেখি ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সুষুপ্তির কোলে পড়িয়া আছে, কেবল প্রহরী

স্বরূপ এক পাশে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। ষ্টীমারের ক্ষীণালোকে তাঁহাকে ভালরূপ চিনিতে না পারিয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোথা হইতে আস্‌ছেন?" প্রশ্ন শুনিয়াই সন্ন্যাসী ঠাকুর চতুর্গুণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রোধব্যঞ্জক ভাবভঙ্গি সহকারে সজোরে হস্ত বিক্ষেপ করতঃ বলিয়া উঠিলেন, "তোর বাবার বাবার যেথানে জন্ম, আমি সেথান থে'কে আস্‌ছি।" স্বর ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম ইনি কৃষ্ণানন্দজী। ইনি স্বভাবতঃই রুক্ষভাষী ও কোপন স্বভাব বিশিষ্ট, তাই তাঁহাকে আমি "দুর্ব্বাসা-ঋষি" বলিয়া ডাকি; দুর্ব্বাসা ভায়ার মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট হইয়া অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলাম। ঐ রাত্রে ষ্টিমারেও একবার দীক্ষা-কার্য্য হইয়া গিয়াছে। শেষ রাত্রে আবার হ'লেও হ'তে পারে। আমি মনে মনে যত সংকল্প করিয়াছিলাম, সবই চুরমার হইতে লাগিল। বাকী রাত্র নিতান্ত অস্থির ভাবে কাটাইতে লাগিলাম। বাটীতে যে গর্ব্বের ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম, এখন হইতে তাহা তিল তিল করিয়া স্মরণ পটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বড় দাদার বন্দোবস্ত ঠিক থাকিলে এত দিনে বধূদের দীক্ষা-কার্য্য সু-সম্পন্ন হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইত। কিন্তু আমি মাঝখানে গোলমাল বাধাইয়া সকল বোঝা নিজ ঘাড়ে চাপিয়া এখন অকুলে হাবুডুবু খাইতেছি; এমন কি বধূদের দীক্ষা কার্য্যও না হইবার যোগাড় করিয়া বসিয়াছি। স্ত্রী, বধূদ্বয় ও ছোট ছোট ছেলে সহ মোট ৭ জন আসিয়াছি; ইহাদিগকে চাঁদপুর রাখিয়া না গেলে কোথায় লইয়া যাই, কি করি, পাথেয় খরচও অতি সামান্য আছে, ইত্যাদি চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম; ভাবিলাম, ঠাকুরত ৩টার সময় উঠেন, তখন গিয়াই তাঁহার পায় পড়িয়া অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চাইব এবং বধূদের দীক্ষা কার্য্য সারাইয়া নেওয়াইবার প্রার্থনা করিব। কিন্তু হায়, ৩টা বাজিল, ৪টা হইয়া গেল, ঠাকুর গাঢ় নিদ্রায়! আমি পাগলের প্রায় ঠাকুরের কামরায় বার

বার আসি আর যাই, আর ভাবি, ঠাকুর বুঝি আমাকে সাজা দিবার জন্যই নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া আছেন। ৫টা বাজিবার অল্প বাকী, হুইসেল পড়িল, ঢাকার ষ্টীমার ছাড়িয়া গেল, ভাবিলাম হুইসেলের শব্দে ঠাকুর জাগিয়া উঠিবেন। কিন্তু কৈ, ঠাকুরের কোন সাড়া শব্দই নাই! ক্রমে গোয়ালন্দের ষ্টীমারেও হুইসেল দিল, গুরু-ভাই যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, আমার কাহিনী শুনিয়া সকলেই দুঃখ করিতে লাগিলেন। যে ভাবে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বড় দাদার কার্য্যের প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছি সে স্ফীতবক্ষ ভাঙ্গিয়া একটুখানি হইয়া গেল; তাহাও অনুতাপানলে পুড়িয়া খাই হইতে লাগিল। প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা যখন চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঠাকুরের নিকট অন্তর হইতে কাতর প্রার্থনা আসিল। একটু পরে দেখি ঠাকুর এ-পাশ ও-পাশ হইতেছেন। বুঝিলাম, কঠোর বজ্র দ্রব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। আমি উন্মত্তপ্রায়, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়! একেবারে ঠাকুরের চরণে গিয়া পড়িলাম। ব্যস্তভাবে বলিলাম, "বাবা, আমি ত দীক্ষার জন্য বউদেরে নিয়া আসিয়াছি।" ঠাকুর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটাইয়া দিলেন। গর্ব্বোন্নতশিরে স-জোরে কসাঘাত করিলেন। সেই সে দশ দিন পূর্ব্বে বাড়ীতে বড় দাদাকে যে সগর্ব্ব বাক্য বলিয়াছিলাম—"আমিই বধুদের নিয়ে যাব, আজ মটর ফিরাইয়া দিন"—সেই সাহঙ্কার উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বেশ শাসন-সূচক স্বর ও ভাব অবলম্বন করতঃ রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাম্ লে-যায়গা, হ্যাম্ লে-যায়গা; এভি হ্যাম কেয়া করেগা"! ঠাকুরের বাক্য ও স্বর শুনিয়া আমার পদনখ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। পূর্ব্বকৃত অপরাধ মূর্ত্তিমান হইয়া চোখের সামনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কুলীশ কঠোর মুহূর্ত্ত মধ্যে কুসুম কোমল হইয়া পড়িল।

পদাশ্রিত দাসকে আর কত কসাঘাতই করিবেন, তাই তাড়াতড়ি উঠিয়া শৌচে গেলেন।

অতগুলি স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তান লইয়া যেরূপ বিপদে আবদ্ধ হইয়াছি, ইতিমধ্যে ষ্টীমারের অফিসার, সারেঙ্গ প্রভৃতি সকলেই তাহা অবগত হইয়া দীক্ষান্তে এগুলিকে নামাইয়া নিয়া যাওয়ার অপেক্ষার ষ্টীমার ছাড়িতে দিল না, প্রায় এক ঘণ্টা দেরী করিয়া ফেলিল, অন্যান্য গুরু-ভাইদের অনুরোধে সারেঙ্গ সাহেব এখনও ষ্টীমার ছাড়িতেছেন না। ইতিমধ্যে ঠাকুর শৌচ হইতে আসিয়া দীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বধূগণ দীক্ষার কোঠায় প্রবেশ করিল, অন্য একটী নিতান্ত দরিদ্র স্ত্রীলোক পূর্ব্ব রাত্র হইতে দীক্ষার জন্য ষ্টীমারে প্রবাস করিতেছিল। শুনিলাম এ সময় এস্থানে দীক্ষা না হইলে তাহার আর ঠাকুর দর্শনের কোন আশাই নাই। ঐ স্ত্রীলোকটীও দীক্ষার জন্য প্রবেশ করিল। এ দিকে ষ্টীমার ক্লার্ক আসিয়া আমাদিগকে জানাইলেন, আর ষ্টীমার রাখা যায় না। এক ঘণ্টার উপর দেরী হইয়া গিয়াছে। একটু পরে ঐ স্ত্রীলোকটী দীক্ষা পাইয়া নামিয়া গেল। নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। কিন্তু বধূদের দীক্ষা শেষ হইতেছে না। মনে হইল ঠাকুর ইচ্ছা করিয়াই ঐ স্ত্রালোকটীকে সারাইয়া দিয়া আমাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। প্রায় ৫।৭ মিনিট ষ্টীমার অগ্রসর হওয়ার পর বধূদের দীক্ষা কার্য্য শেষ হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম ঠাকুর আমাদিগকে তাঁহার শ্রীচরণের সাথী করিবার জন্যই এই ফিকির করিয়াছেন। যত জোরে কসাঘাত করিতেছিলেন তাহার শতগুণ স্নেহের কোমল করে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলেন। কাণে ধরিয়া সঙ্গ-সুখ ভুঞ্জাইতে লাগিলেন, ক্রমে মাদারীপুর, বাজিতপুর বরিশাল পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গ-লাভ করিলাম। এ ভ্রমণ উপলক্ষে যে অপার আনন্দ উপভোগ করিয়াছি তাহা জীবনে

ভুলিবার নহে। এই সঙ্গই ঠাকুরের শেষ সঙ্গ। ঠাকুরের কৃপায় শাপে বর হইল। ঠাকুরের শেষ সঙ্গ-লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইল।

বসন্ত মশার কামড়ে পরিণত।

৺শিব চতুর্দ্দশীর পর বাজিতপুর হইতে ঠাকুরের সহিত ষ্টীমারে বরিশাল চলিয়াছি। ঠাকুর ষ্টীমারে উঠা অবধি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে বার বার লোক পাঠাইয়া আমার খবর নিতেছেন—কি ভাবে আছি, বসার সুবিধা হইল কিনা, ছেলে বধুরা সব সুস্থ আছে কিনা, ইত্যাদি। ঐ দিন শেষ্ রাত্র হইতে শিশু-পুত্র (বয়স ২॥ বৎসর) শান্তিময়ের জ্বর আরম্ভ হইল, ক্রমে দাস্তও হইতে লাগিল। আবার বিপদ গণিলাম। পরদিন বেলা ১০টার সময় বরিশাল পৌছছিলাম। এ যাত্রায় ঠাকুরের সঙ্গে আমরা প্রায় ৩০ জন আসিয়াছি; তন্মধ্যে শিশু সন্তান ও স্ত্রীলোক লইয়া আমার বোঝাই বেশী ভারী, কর্ম্মকুশল বরিশালবাসী গুরু-ভ্রাতাগণের বিচক্ষণতায় আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসায় অবস্থান করিতেছি। কিন্তু পুত্রটীর অসুখ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি তাহার গায়ে ঘামের মত কি উঠিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে একথা সকলের কর্ণগোচর হইল। ডাক্তার কবিরাজ আসিয়া দেখিতে লাগিলেন, সকলেই ভাল বসন্ত বলিয়া স্থির করিলেন, পূর্ব্ব হইতেই জ্বর ও দাস্ত হইতেছিল, এখন আবার বসন্তের আবির্ভাব দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, ঠাকুর এ আবার কোন্ অপরাধের সাজা দিতে আরম্ভ করিলেন। গুরু-ভ্রাতাগণও আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি করিতেছেন। ডাক্তার অজিত বাবুর মতানুযায়ী ঔষধ চলিতেছে। যাঁহাদের বাটীতে আছি, তাঁহারাও ছেলের

বসন্ত দেখিয়া চিন্তিত ও ভীত হইলেন। আমাদিগকে ফেলতেও পারেন না, রাখতেও ভয়। সেইদিন সন্ধ্যায় বরিশাল আশ্রমেই ঠাকুরের আরতি হইল। লোকে লোকারণ্য, ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছি, ঠাকুরের ভক্ত শিষ্য প্রবীণ উকীল বাবু শশীকান্ত গুপ্ত মহাশয় আরতি অন্তে ঠাকুরের স্তুতিবাচক এক অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সকল দিকেই যেন আনন্দ স্রোত বহিয়া যাইতেছে। কেবল আমি হতভাগা এক কোণে দাঁড়াইয়া ছেলের ভাবনাই ভাবিতেছি। মনে হইল একবার তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া এক স্ত্রীকে বৈতরণী তীরে রাখিয়া আসিয়াছি, না জানি এবার এক ছেলেকে বরিশালে রাখিয়া যাই। গর্ব্বের প্রায়শ্চিত্তের বুঝি আরো বাকী আছে। শোকে, দুঃখে, অনুতাপে একান্ত কাতর হইয়া ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। মনে মনে ঠাকুরকে প্রাণের আবেগে অনেক কিছু নিবেদন করিলাম। প্রার্থনায় প্রাণে প্রচুর বল ও শান্তি পাইলাম। আরতি থামিয়া গেল, তাড়াতাড়ি বাসায় গেলাম। খোকাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। তাহার গায় হাত দিয়া দেখি জ্বর নাই। আলো ধরিয়া দেখি বসন্তগুলি যেন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ছেলে বেশ হাসিতেছে, কথা বলিতেছে। প্রাণে অপার আনন্দ হইল। রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হইল। ছেলেরও আর কোন উপদ্রব দেখা গেল না। সে শোঁ শোঁ করিয়া শ্বাস টানিয়া ঘুমাইতে লাগিল। রাত্র প্রভাত হইল, ডাক্তার কবিরাজ গুরু-ভাই-ভগ্নীগণ আসিয়া দেখিতে লাগিলেন, কোথায় পানিবসন্ত? সব মরিয়া শুকাইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে যেন ঠিক কতকগুলি মশার কামড়ের মত সামান্য দাগ পড়িয়া আছে। ছেলের জ্বর নাই, দাস্ত থামিয়া গিয়াছে—শান্তিময় শান্তিময়ের আশীর্ব্বাদে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিল।

শেষ বিদায়।

ঠাকুরের সহিত বরিশাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ শেষ করিয়া ভবানীগঞ্জ হইয়া লক্ষ্মীপুর আসার মনস্থ করিয়াছি, ঠাকুরের নিকট বিদায় নিতে গেলাম, ঠাকুর ভক্তগণের প্রাতঃকালীন পূজা গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম কোঠায় প্রবেশ করিয়াছেন, দীক্ষাপ্রার্থিগণ সারি সারি বসিয়া আছে, একটু পরেই ঠাকুর দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিবেন, সুযোগ বুঝিয়া আমি ও বন্ধুবর বাবু রাসবিহারী রায় ঠাকুরের কোঠায় প্রবেশ করিলাম। ঠাকুরের চরণতলে উপবেশন করিয়া দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিলাম। ঠাকুর সস্নেহ মধুর সম্ভাষণে ফিরিতে আদেশ দিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিতেই ঠাকুর নবীনানন্দজীকে প্রসাদ দিতে বলিলেন। নবীনানন্দজী একটী বড় নারিকেল প্রসাদ দিতেই ঠাকুর বাধা দিয়া বলিলেন, "ইহারা নারিকেলের দেশের লোক, দেশে নেওয়ার জন্য অন্য প্রসাদ দেও।" নবীন দাদা বেদানা ও কমলা প্রসাদ দিলেন, পিতা যেমন পুত্রকে দূরদেশে বিদায় দিবার সময় কত স্নেহে কত আদরে কত কথাই বলে, ঠাকুরও তদ্রূপ কত কথাই বলিলেন; নিজ পরিবারের কথা, ছেলে শিশুর কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। অবশেষে স্নেহের কোমল কর পিঠে বুলাইতে বুলাইতে কত কিছু বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় দিলেন। ঠাকুর! এই কি তোমার পাঞ্চভৌতিক শেষ দর্শন? সাধন-ভজন-বিহীন অধম জন আর কি তোমার চরণ দেখিতে পাইবে না? এই কি তোমার শেষ বিদায়?

অনামিকা সঙ্কেতে বালবিধবাকে নাম শিক্ষা

শ্রীমতি হেমনলিনী নাগ, লামচর (নোয়াখালী) নিবাসী ৺ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা, নোয়াখালী জজ কোর্টের উকীল বাবু মনোরঞ্জন চৌধুরী এম,এ, বি, এল্, মহাশয়ের ভগ্নী এবং স্থচীপাড়া (ত্রিপুরা) নিবাসী প্রসিদ্ধ নাগ পরিবারের ৺মহেশচন্দ্র নাগ মহাশয়ের পুত্রবধূ। ইনি ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বিধবা হন, তিনি এইক্ষণ ৺কাশীধামে আছেন। বিগত ১৩৩৫ সনের ফাল্গুন মাসে ৺কাশীযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের একটী ঘটনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই :—

"আমি বাং ১৩১১ সনের মাঘ মাসের মধ্যভাগে বিধবা হইয়াছি, মৃতাশৌচ অবস্থায় আমার শোয়ার ঘরে খড়ের বিছানায় শোয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। একে অল্প বয়স, তাহাতে সদ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তায় মনোক্লেশে শান্তিহীন অবস্থায় দিনরাত কাটাইতেছি, ১২ই কি ১৩ই ফাল্গুন রাত্রে খড়ের বিছানায় চিৎ হইয়া বুকের উপর দু'হাত রাখিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছি।

"রাত্রি অনুমান ২ ঘটিকার সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, জাগিয়া বোধ হইতে লাগিল কেহ আমার শিয়রের নিকট দাঁড়াইয়া আছে; একটু পরেই শিয়রের দিক হইতে কেহ বলিয়া উঠিলেন, "নাম কর, নাম কর, দুঃখ-ভয় সব কে'টে যাবে।" ইহা শুনিয়া আমার মনে কোনরূপ ভয় ভাবনা উপস্থিত হইল না এবং বেশ সাহস বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথা হইতে কে একথা বলিল জানিবার জন্য গাত্রোত্তোলন বা শিরঃসঞ্চালন করার ইচ্ছা হইল না। ঠিক ঐ ভাবে চিৎ হইয়া শোয়া অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "দুঃখও কেটে যাবে, ভয়ও কে'টে যাবে এমন সে কি নাম ?"

প্রত্যুত্তরে 'এই নে' বলিয়া আমাকে একটী নাম দিলেন, তাহা একটু দীর্ঘই বটে। আমি বলিলাম, 'আমারত নাম মনে থাকে না।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথার উপর দিক হইতে চ'খের সামনে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা আঙ্গুলীটী বাহির হইয়া আসিল এবং শিয়রের দিক হইতে বলিলেন, 'সঙ্গে সঙ্গে নাম কর।' এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলী ঘুরাইতে ঘুরাইতে নাম করিতেছেন, আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতেছি। এভাবে কিছুক্ষণ নাম করিতে করিতে যখন নাম প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া আসিয়াছে তখন বলিলেন, 'চ'খ বুজ', আমি তৎক্ষণাৎ চ'খ বুজিলাম, চ'খ মুদ্রিত অবস্থায় দেখি বাদামী ধরণের একটা কি জিনিস—তাহার চারিধার হইতে তীব্র অথচ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, তাহার তেজে সমস্ত ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ জ্যোতির অভ্যন্তরে ঐ বাদামী জিনিসটীর মধ্যে উজ্জ্বল সোণালী রংএর অক্ষরে আমার প্রদত্ত নামটী ফুটিয়া রহিয়াছে। চ'খ মেলিলাম, ঐ চ'খ বুজা অবস্থায় যেরূপ দেখিয়াছি, চ'খ মেলিয়াও তদ্রূপ দেখিতেছি; তখন আর কাহাকেও দেখিতেছিলাম না। কেবল ঐ উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিশিষ্ট বাদামী জিনিসটী ও তন্মধ্যস্থ সোণালী রং মাখান নামটাই দেখিতেছি; ঘরের মধ্যে বেড়া থাকিলেও বেড়া ভেদ করিয়া কাচের আবরণের ন্যায় ঐ জ্যোতিঃ ঘরের বাহির পর্য্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছিল, ঘরের কোন বেড়াই নাই। যতদূর পর্য্যন্ত জ্যোতিঃ ফুটিয়াছে তাহার বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ঘরখানা মাত্র জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আছে। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ জ্যোতির দিকে তাকাইতে তাকাইতে আমার চ'খ ঝলসিয়া গেল, আমি চ'খ মুদিয়া ফেলিলাম। এভাবেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, আমার আর কোনরূপ নিদ্রা বা তন্দ্রা আসিল না।

"রাত্রি প্রভাত হইল, একটু একটু করিয়া নাম করিতেছি, ক্রমে অবিশ্বাস আসিয়া দেখা দিল। মনে হইল যদি হরিনাম করলেই দুঃখ কেটে যায় তবে অত লোক দুঃখ পায় কেন? হরিনামেই ত সকলে শান্তি পাইত। যেইমাত্র এ সব কথা মনে উদিত হইল তার সঙ্গে সঙ্গেই নাম ছুটিয়া গেল, আর নামের নেশা নাই। নাম করিতে আর ইচ্ছা হইল না, নাম ছাড়িয়া দিলাম।

"তৎপর ৪ চারি বৎসর পর্য্যন্ত আর ঐ নাম করি নাই। চারি বৎসর পর একদিন ভাগবত পাঠ করিতে করিতে একটী শ্লোকের বাঙ্গালা পড়িলাম ঃ—

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়মুত্তমং।
শাব্দে পারেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মন্যুপসমাশ্রয়েৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ)

'একান্ত মঙ্গল জানিতে অভিলাষী জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দ ব্রহ্মের পরগামী ও পরব্রহ্মে নিমগ্ন উপশমাবলম্বী এমন ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার স্মরণাপন্ন হইবে।' এই শ্লোক দেখিয়া মনে মনে দীক্ষা লওয়ার জন্য একটা ব্যাকুলতা আসিল। ক্রমে স্বামীজী মহারাজের নাম শুনিলাম। লামচরের কেহ তাঁহার নিকট দীক্ষা নিয়াছে শুনিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা নেওয়ার আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু তখনও তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে নাই। মাতা ঠাকুরাণীর কথায় দীক্ষার প্রার্থনা করিয়া স্বামীজী মহারাজের নিকট পত্র লিখিলাম। পত্রোত্তরে তিনি এইমাত্র লিখিলেন, 'বিশ্বাস হইলে দীক্ষা হইবে।' এভাবে আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩১৯ সনে স্বামীজী মহারাজ কলিকাতা আসিয়াছেন শুনিয়া আমার মাতুল লামচর নিবাসী সবরেজিষ্ট্রার বাবু তারাকুমার রায়ের সহিত স্বামীজীর দর্শনে কলিকাতা গেলাম।

ঠাকুর তখন ২১১নং হ্যারিসন রোডে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহার সহিত একেবারে ঐ স্থানে গিয়া ঠাকুর দর্শন করিলাম। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নিকটে উপবেশন করিতেই প্রথমে তাঁহার অনামিকার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। হঠাৎ পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগরূক হইল। সেই ৭ বৎসর পূর্ব্বে অশৌচ সময়ে শোক-শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমার শিরের উপর দিয়া চ'খের সামনে যে অনামিকা বাহির হইয়া আসিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আমাকে 'নাম' শিখাইতেছিল, এই দেখি অবিকল সেই অনামিকা ? আমার সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। এ অনামিকা যে সেই অনামিকা তার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

"দীক্ষার বাসনা প্রবল হওয়ায় ঠাকুরের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলাম। ঠাকুর দীক্ষার দিন ও সময় স্থির করিয়া দিলেন। দীক্ষার দিন পুণ্যসলিলা ভাগীরথী জলে স্নাত হইয়া উক্ত ২১১নং হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরের নিকট দীক্ষার জন্য উপবেশন করিয়াছি। ঐ কোঠায় আর কেহ ছিল না,—আমি আর ঠাকুর। প্রথমেই চুপি চুপি খুব ধীরে ধীরে আমাকে বলিলেন, "তোর দুঃখ দেখে নাম দিয়ে এসেছিলাম, বল সে নাম হারিয়ে কত কষ্ট করেছিস, কত কষ্ট পেয়েছিস্।" এভাবে ৪।৬বার এইকথা বলিলেন। তৎপর সেই ৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে শোক-শয্যায় রাত্রি ২টার সময় বাদামী জিনিসের ভিতর সোণালী রং এর যে নাম ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অঙ্গুলী সঙ্কেতে ঐ মহাপুরুষ যে নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া আমাকে শিখাইয়াছিলেন, আজ ঠাকুর ঠিক ঠিক সেই নামটীই আমাকে দিলেন। অতঃপর নামের প্রতিপাদ্য কি তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আমি ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব দয়া ও লীলার কথা ভাবিতে ভাবিতে দীক্ষা স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

শয্যাশায়ি-রোগিনী বদ্রির পথে।

স্বর্গীয়া কুঞ্জমালা চৌধুরাণী * বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। কিছুদিন পর তিনি জ্বর ও রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। এ সময় কতিপয় গুরু-ভ্রাতা বদ্রীনারায়ণ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঠাকুরের অনুমতি চাহিলেন, ঠাকুর তাঁহাদিগকে অনুমতি দিয়া কুঞ্জমালাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন এবং কুঞ্জমালাও এই উপযুক্ত সাথীর সুযোগ অবলম্বন করিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। কুঞ্জমালা চলৎ-শক্তি রহিত,—একরূপ শয্যাশায়িনী অবস্থায় আছেন, কি ক'রে এ সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিবেন। পরদিন প্রাতঃকালেই গুরু-ভ্রাতাগণ যাত্রা করিবেন। ঠাকুর যাইতে বলিয়াছেন, শুধু এই সাহসেই তিনিও যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন। পথের সম্বল লোটা কম্বল পুটুলি বান্ধিয়া শেষ রাত্রে কোনরূপে ধর্ম্মশালা হইতে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আশ্রম হইতে বাহির হইয়াছেন,—এ সময় হইতে তাঁহার উপর নামের এক অপূর্ব্ব ক্রীড়া আরম্ভ হইল। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ঐ সময় হইতে **নাম** যেন জীবন্ত ভাবে তাঁহার ভিতর স্ফুর্ত্তি পাইতে লাগিল। তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা, মানসিক অবসাদ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঠিক সুস্থ লোকের মত

* ইনি লামচরবাসী পূর্ব্ব-কথিত স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী ও বাবু মনোরঞ্জন চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের মাতা। ইনি যেমন শিক্ষিতা তেমনই ভক্তিমতী ও শ্রদ্ধাপরায়ণা এবং ঠাকুরের প্রতি একান্ত অনুরক্তা ছিলেন। ইনি সাংসারিক গৃহস্থালীর কার্য্য নির্ব্বাহান্তে রাত্রি জাগিয়া গুরুমুখী ভাষা শিক্ষা করতঃ গুরুমুখী ভাষায় লিখিত সমগ্র তুলসীদাসের রামায়ণ ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ বহুবার পাঠ করিয়াছেন। ইঁহার কাশী প্রাপ্তি অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা পরিপূর্ণ।

সঙ্গীয় সকলের সাথে পদব্রজে পথ চলিতেছেন। পাহাড়ীয়া পথ—চড়হি উৎরহি ভ্রূক্ষেপ নাই—নামানন্দে বিভোর হইয়া সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া গিয়াছেন। এভাবে কেদার বদ্রীর সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় ১॥০ দেড় মাসে পুনঃ হরিদ্বার আশ্রমে ঠাকুরের চরণে উপস্থিত হইলেন।

মা থাকবে কাশী, তুই যাবি কোথায় ?

১৩৩৩ সনের কুম্ভমেলার পর কুঞ্জমালা ও কন্যা শ্রীমতি হেমনলিনী হরিদ্বার হইতে কাশী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঠাকুরের নিকট বিদায় নিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর হেমনলিনীকে বলিলেন, "মা ত থাকবে কাশী, তুই যাবি কোথায় ?" হেম বলিল, "মা যত দিন কাশী থাকেন আমিও ততদিন কাশী থাকব। তিনি যখন বাড়ী যাবেন আমিও তখন তাঁর সঙ্গে বাড়ী যাব।" ঠাকুর মুচকি হাসিয়া আবার বলিলেন, "না লো না, মা ত কাশী থাকবে, তুই যাবি কোথায় ?" হেম মনে করিল ঠাকুর বুঝি তাহার কথা বুঝেন নাই। আবার তার নিজের কথা বলিল ; ঠাকুরও আবার সেই কথাই বলিলেন। তাহারা ঠাকুরের কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। যা হউক তাঁহারা কাশী আসিলেন ; কাশী পঁহুছার অল্প পরেই কুঞ্জমালার কাশী প্রাপ্তি ঘটে। হেমনলিনী তখন চ'খের জলে বুঝিতে পারিল ঠাকুর যে হরিদ্বারে বলিয়াছিলেন, "মা ত থাকবে কাশী, তুই যাবি কোথা" এ কথার অর্থ কি।

তৃতীয় অধ্যায়।

উপদেশাবলী।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
(গীতা ২।৫৯)

রসবর্জ্জং কিরূপ?

(১) এক সময়ে রাজর্ষি জনকের নিকট সাত জন ঋষি উপস্থিত হইয়া আহার প্রার্থনা করিলেন, জনক অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যাদি প্রস্তুত করাইয়া সাতখানা থালাতে সাজাইয়া ঋষিদেরে আহার করিতে দিলেন। কিন্তু তাহাদের মস্তকোপরি ৭ খানা খুব ধারাল খড়্গ অতি সূক্ষ্ম সূতা দ্বারা টানাইয়া দিলেন এবং ঋষিগণকে বলিলেন, "আপনারা শীঘ্র শীঘ্র ভোজন কার্য্য সমাধা করুন, নতুবা খড়্গ পড়িয়া মাথা কাটা যাইবার আশঙ্কা আছে।" ঋষিগণ খুব তাড়াতাড়ি আহার করিয়া আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, আপনাদের আহার সুসম্পন্ন হইয়াছে ত?" ঋষিগণ উত্তর করিলেন—"হাঁ, হয়েছে বটে, কিন্তু "রসবর্জ্জং।"

(২) একদিন শ্রীকৃষ্ণজী গোপীগণকে আদেশ করিলেন—গুরুদেবকে কিছু ভোজন দিয়া আসিতে হইবে। গোপীগণ ভাল ভাল খাবার প্রস্তুত

করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"যমুনার উপর কোন সেতু নাই, খেওয়া নাই, আমরা কি করে যমুনা পার হইব ?" শ্রীকৃষ্ণজী বলিলেন, "তোমরা ভোজন লইয়া যমুনা-তীরে গিয়া বল—"হে যমুনে, আমাদের স্বামী শ্রীকৃষ্ণজীর যদি চির-কৌমার-ব্রত সত্য হয়, তবে তুমি দু-ভাগ হইয়া আমাদের পথ করিয়া দেও।" ষোল হাজার গোপীর মধ্যে কেহই যাইতে স্বীকার করিল না। তখন শ্রীরাধা অন্য একজন সখীসহ যাইতে স্বীকার করিলেন। তাঁহারা যমুনার ধারে গিয়া বলিলেন, "হে যমুনে, যদি আমাদের স্বামী শ্রীকৃষ্ণজীর চির-কৌমার-ব্রত সত্য হয়, তবে আমাদের পথ করিয়া দাও।" যমুনা তৎক্ষণাৎ দুভাগ হইয়া পথ করিয়া দিল। ষোল হাজার গোপী খাবার লইয়া দুর্ব্বাসা ঋষিকে ভোজন করাইলেন; দুর্ব্বাসা ঋষি ষোল হাজার থালা খাবার খাইয়া ঢেকুর উঠাইলেন। গোপীগণ বলিলেন—"গুরুদেব, এখন আমরা যাব কি করে?" ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এসেছ কি করে?" গোপাগণ যে ভ'বে এসেছিলেন, সে কথা ঋষিকে বলিলে ঋষি বলিলেন, "এখন গিয়ে বল—আমাদের গুরু দুর্ব্বাসা ঋষির চির-অনশন-ব্রত যদি সত্য হয়, তবে হে যমুনে! আমাদের পথ করিয়া দাও। গোপীগণ যমুনা-তীরে যাইয়া তাহা বলাতে তৎক্ষণাৎ যমুনা দু' ভাগ হইল। গোপীগণ অনায়াসে ঐ পথ দিয়া চলিয়া আসিলেন।

এস্থলে দুর্ব্বাসা ঋষির আহার 'রসবর্জ্জং'।

ইহলোকে থাকিয়াও স্বর্গবাসের চিহ্ন কি ?

স্বর্গে স্থিতানামিহ জীবলোকে
চত্বারি চিহ্নানি নিবসন্তি দেহে ।
দান প্রসঙ্গ মধুরা চ বাণী
দেবার্চ্চনা চাতিথিতর্পণঞ্চ ॥

এই পৃথিবীতে থাকিয়াও যাহারা স্বর্গবাস করিতেছে তাহাদের চিহ্ন কি কি ? উত্তর—দান, মধুর বাক্য, দেবার্চ্চনা ও অতিথি সৎকার ।

অন্তর্য্যামীর তিন জেলখানা ।

মানুষ বে-আইনী কাজ করিলে রাজা তাহাকে জেলে দিয়া থাকেন, অন্তর্য্যামী তিন প্রকারের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিন প্রকার জেলের ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

(১) শারীরিক বা কায়িক পাপের জেলখানা কুষ্ঠব্যাধি । (২) বাচনিক পাপের জেলখানা মূকত্ব (বোবা হওয়া) ; (৩) মানসিক পাপের জেলখানা অন্ধত্ব ।

কোন্ কোন্ কার্য্য পরিত্যাগ করিবে ?

যে প্রকার কার্য্যে তোমার নিজের দুঃখ লাগে, সে প্রকার কার্য্য ছেড়ে দেও, তাহা হইলে তুমি দেবতা হইয়া যাইবে ।

তোমাকে নিন্দা করিলে তুমি দুঃখ পাও; সুতরাং তুমি অপরের নিন্দা করিও না, ইত্যাদি।

পক্ষিণাং কাকচণ্ডালঃ পশুনাং গর্দ্দভঃ,
মুনিনাং ক্রোধঃ চণ্ডাল সর্ব্বচণ্ডাল নিন্দকঃ।

ইন্দ্রিয় শত্রু কি মিত্র ?

এক রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তিনি প্রচার করিয়া দিলেন—আমার পাঁচটী ছাগল আছে, যে আমার এই পাঁচটী ছাগলকে পেট পুরাইয়া খাওয়াইতে পারিবে,তাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। অনেক রাজা আসিয়া ছাগল পাঁচটীকে খুব পেট পুরিয়া খাওয়াইলেন, কিন্তু রাজার সম্মুখে ছাগল গুলিকে নেওয়া হইলে, যখনই তাহাদের সম্মুখে কিছু দানা বা ঘাস ধরা যায়, অমনি তাহারা খাইতে আরম্ভ করে; রাজা বলিলেন—ছাগলের পেট ভরে নাই। এ ভাবে অনেক রাজকুমার আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। অবশেষে এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুঁচ সূতা লইয়া ছাগলের মুখ সেলাই করিয়া দিয়া রাজার সম্মুখে লইয়া গেলেন। রাজা পূর্ব্ববৎ তাহাদের সম্মুখে কিছু দানা ধরিলেন, কিন্তু এবার ছাগল আর কিছু খাইতে পারিল না, একে একে পাঁচটী ছাগলের মুখের কাছে দানা ধরিলেন, কিন্তু ছাগল আর খাইতে পারিল না। তখন রাজা ঐ ব্যক্তির সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিলেন। তদ্বৎ আমাদের ইন্দ্রিয় গুলির ভোগ, ভোগের দ্বারা কখনও নিবৃত্ত হইবে না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছাগলের মুখের ন্যায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই কন্যারূপী প্রেম-ভক্তি লাভ করিতে পারিবেন।

শ্বাস কেন বৃথা নষ্ট কর ?

এক জমিদারের এক নাতি ছিল। তিনি যখন বিদেশে ছিলেন, তখন বাড়ীতে তাঁহার নাতির খুব অসুখ করে, নাতির মুমূর্ষু অবস্থা। জমিদার সংবাদ পাইয়া টেলিগ্রাম করিলেন, "আমি বড় বড় ডাক্তার সঙ্গে নিয়া আসিতেছি, যে ডাক্তার আছে তাহাকে বল, এক লক্ষ টাকা দিব, ছেলের শ্বাস ১০ মিনিট রক্ষা করুক।" কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই তাহা স্বীকার করিল না। দেখ, যে শ্বাসের মূল্য অত অধিক, তাহা কেন বৃথা নষ্ট কর ?

একই গ্লাসে বিষ ও অমৃত।

একই গ্লাসে লেবুর রস ও দুধ থাকিতে পারে না। কিন্তু ভগবান্ একই গ্লাসে বিষ ও অমৃত রাখিয়া দিয়াছেন। যে সংসার দ্বারা জীবের অধোগতি হয়, তাহা বিষ তুল্য, আবার সেই সংসার জীবকে উর্দ্ধদিকে নিয়া তাহার ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সহায় করে, তাহা অমৃত তুল্য।

ভক্তি কিরূপে করিতে হয় ?

ভক্তি কি রকম জান ? শিশু যখন কাঁদিতে থাকে, তখন তাহাকে যত রকম খেলনা দেও না কেন, পিতা কোলে নেউক, ফল, ফুল কি মণিরত্ন দেউক, এমন কি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দিলেও সে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়। কারণ তাহার একমাত্র ভক্তি তখন মায়ের স্তন্যে। যেই মাত্র মা আসিয়া স্তন মুখে দিলেন, তখনই শান্ত হইল। সেইরূপ অন্তর্য্যামী ভগবান্ গুরু মহারাজকে না পাওয়া পর্য্যন্ত শিশুর ন্যায় ভক্তি করিতে হয়, নচেৎ কিছুই হয় না।

আদেশ পালন।

সদ্‌গুরুর আদেশ অবিচারিতভাবে পালন করতে হয়। দেখ, কামার লোহা পুড়িয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া কেমন সুন্দর সুন্দর জিনিষ—ছুরি, কাঁচি, শিকল ইত্যাদি প্রস্তুত করে। লোহা কিছুই বলে না। কারিকর যে ভাবে যখন তাকে পোড়ে, পিটে, সে কিছুই আপত্তি করে না। তদ্বৎ সদ্‌গুরু শিষ্যকে যখন যে আদেশ করেন, শিষ্য নিরাপত্তিতে তথাস্তু বলিয়া সে আদেশ পালন করিবে। তবেই গুরু তাহাকে জ্ঞান উপদেশ দিয়া সুন্দর রত্ন তৈয়ার করিবেন। কিন্তু যে শিষ্য জবাবদিহী হয়, গুরু তাহাকে উপদেশ করেন না। দেখ, নানকের মুর্দ্দানা নামে এক শিষ্য ছিল। নানক একদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া শিষ্যকে আদেশ করিলেন, "মুর্দ্দানা, এখানে একটা কূপ খনন করিতে হইবে।" মুর্দ্দানা আদেশ পাইয়া "তথাস্তু" বলিয়া দিনভর টুক্‌রী ও কোদালি লইয়া কূপ খনন করিল। পর দিন প্রাতে নানক পুনঃ বলিলেন, "রে মুর্দ্দানা, কূপ ত বেশী গভীর হয় নাই, আরো গভীর করিতে হইবে।" মুর্দ্দানা "তথাস্তু" বলিয়া আবার খনন করিতে লাগিল। এ ভাবে ক্রমাগত ৩ দিন খনন করার পর নানক বলিলেন, "মুর্দ্দানা, এখানে কূপ খনন ভাল হয় নাই। মাটি ফেলিয়া পুনরায় এই কূপ ভর্ত্তি করিয়া দেও।" মুর্দ্দানা "তথাস্তু" বলিয়া ৩ দিন ভরিয়া তাহাই করিল। তখন নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, "রে, মুর্দ্দনা, এভাবে অনর্থক কাজ করাতে তোমার কি একটুও বিকার হইল না?" মুর্দ্দানা উত্তর করিল, "প্রভো! আমার কর্ত্তব্য তোমার আদেশ পালন করা। আমি তাহাই করিয়াছি, তাহাতে আমার বিকার আস্‌বে কেন?" ইহা শুনিয়া নানক শিষ্যের উপর ভারী সন্তুষ্ট হইলেন এবং শিষ্যের অভীষ্ট পূরণ করিয়া দিলেন।

যোগক্ষেমং বহাম্যহং।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

ভগবানের উপর খাঁটি প্রাণে নির্ভর করিলে ভগবান্ তাহার সমস্ত ভার বহন করেন। এক সময়ে দুই সাধু সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইতেছিলেন। পথে রাত্রি হইলে পথেই ধুনী জ্বালিয়া মুখামুখী বসিয়া বেদান্ত চর্চ্চা করিতেছিলেন। সঙ্গে খাবার কিছুই ছিল না। রাত্রি ১১টার সময় এক ব্যক্তি দুইখানা থালা ভরিয়া রুটী, শাক, হালুয়া, দুধ লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "আমি উত্তম জাতি, এখানের পার্শ্বেই আমার কুটীর আছে। আমি আপনাদের জন্য ভোজন নিয়া আসিয়াছি, দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।" তাঁহার কথা বিশ্বাস করতঃ তৎপ্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারা আহার করিলেন। একটু পরে এক প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সাধুরা দুইখানা রুটি দিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। বাঘ বসিয়া বেদান্ত চর্চ্চা শ্রবণ করিয়া চলিয়া গেল। ভগবান্ অন্তর্য্যামী, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদের খবর লইয়া থাকেন। যিনি ভগবানের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দেন, ভগবান্ও তাঁর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অধিকারী-ভেদে উপদেশ।

উপদেশ অধিকারী-ভেদে দিতে হয়। যে যতটুকু অধিকারী, তাকে ততটুকু উপদেশ দিতে হয়। মাতাপিতা সন্তানকে উপদেশ না দিলে সন্তান মূর্খ হয়, তাই জবরদস্তি করিয়াও উপদেশ দেওয়া দরকার।

কিন্তু যে ছেলে বর্ণশিক্ষার অধিকারী তাকে বড় বড় বিজ্ঞান, জ্যোতিষ-তত্ত্বের কথা বলিয়া কোনও ফল নাই। তাই যে যতটুকু অধিকারী, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাকে ততটুকুই উপদেশ দিবেন।

নিষিদ্ধ আহার।

তিন প্রকারের আহার নিষিদ্ধ :—

(১) জাতি-দুষ্ট—যেমন মৎস্য, মাংস, পেঁয়াজ, রশুন ইত্যাদি।

(২) নিমিত্ত-দুষ্ট—যেমন দোকানের মাছিপড়া, ধূলা পড়া খাবার।

(৩) আশ্রয়-দুষ্ট—যেমন অসৎ লোকের স্পৃষ্ট অন্ন।

বিভিন্ন মার্গের ফলাফল।

ভক্তি-মার্গের ফল দেরীতে হয় (slow process) কিন্তু সহজ-সাধ্য। যোগ-মার্গে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বিভূতি-পথে মন চলে গেলে আর স্বরূপে পৌঁছিতে পারে না। জ্ঞান-পথ আশুফলপ্রদ, কিন্তু গুরুর আদেশ পালন ও ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার কঠোরতা আছে। দ্বিধাশূন্য হইয়া গুরুর আদেশ পালন ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা, ইহাই (secret of success) কৃতকার্য্য হইবার একমাত্র গূঢ় উপায়।

স্বরূপ স্বরূপে স্থিতি।

দুই ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া একস্থানে উপস্থিত হইল। তাদের একজনকে দোতালায়, উৎকৃষ্ট কোঠায় শুইতে দেওয়া হইল এবং তাহার

ঘোড়া খোলা ময়দানে রাখিয়া দেওয়া গেল। অপর জনের স্থান নীচের তালায় ঘোড়ার ঘরে, ঘোড়া সহ দেওয়া হইল। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কেহই নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিল না। প্রথম জনের স্থান উত্তম হইল বটে, কিন্তু ঘোড়া খোলা মাঠে আছে বলিয়া ঘোড়ার চিন্তায় তাহার ঘুম হইল না। দ্বিতীয় জন যদিও ঘোড়াসহ আছে, কিন্তু ঘোড়া-ঘরের ঘোড়ার লাদের দুর্গন্ধে তাহার ঘুম হইল না। এখন কি করলে উভয়ে সুখী হইতে পারে?—যদি স্বরূপ স্বরূপে মিশিয়া যায় অর্থাৎ উভয়ে দোতালায় একত্রে এবং তাহাদের উভয়ের ঘোড়া ঘোড়া-ঘরে রাখা হয়। তদ্বৎ শিষ্য যদি গুরুর সঙ্গে মিশিয়া যায় অর্থাৎ পঞ্চভূত পঞ্চভূতের সঙ্গে এবং আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশিয়া যায়, তবে উভয়ের সুখ হয়।

কি ভাবে সংসার করিবে।

এক রাজা একদিন তাঁহার গুরুকে বলিলেন :—গুরু-দেব, এই রাজত্ব সংসার আর ভাল লাগে না, এই রাজত্ব যদি কেহ চায় তাহাকে দিয়া আমি খালাস হইতে পারি।

গুরু :—বেশত, যদি রাজত্ব ভাল না লাগে এবং কাহাকেও দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে দিতে পার?

রাজা :—হাঁ, নিশ্চয় পারি, এই নেন, এই কথা বলিয়া রাজা গুরুকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়া দিলেন। অতঃপর গুরু বলিলেন :—দেখ রাজা, এই রাজত্ব এখন আমার; তুমি যথায় ইচ্ছা যাইতে পার, এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিবে না, কিন্তু এই রাজ্যের একগাছি তৃণও নিতে পারিবে না। এখন সবই আমার।

রাজা স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পথের বাহির হইলেন। কোথায় যাবেন, কিভাবে দিন গুজরাবেন, শিশু-সন্তান লইয়া কোথায় দাঁড়াবেন চিন্তা করিতেছিলেন, রাজার এহেন অবস্থায় গুরু বলিলেন, "যদি কোথাও চাকরি জোঠে তবে তাহার চাকরি করিতে পার।" রাজা :—কে-ইবা আমাকে চাকর নিযুক্ত করিবে? আর কে-ইবা আমার ভরণ পোষণো-পযোগী অত মাহিনা দিবে?

গুরু :—তোমার কত মাহিনা হইলে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতে পারে?

রাজা :—মাসিক অন্ততঃ ৫ হাজার টাকা হইলে আমার সংসার স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

গুরু :—আচ্ছা, বেশ; তুমি আমার অধীনে চাকরি কর। আমার এই রাজত্বে তোমাকে চাকর (ম্যানেজার) নিযুক্ত করিলাম, অদ্য হইতে তুমি আমার চাকর নিযুক্ত হইলে, মাসিক ৫ হাজার টাকা মাহিনা পাইবে; এখন হইতে তোমার কাজ এই হইল, পূর্ব্বে যে যে কাজ করিতে এখনও সেই সেই কাজই করিতে থাক।

এই আদেশ পাইয়া রাজা অত্যন্ত খুসী হইলেন। আনন্দের সহিত পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন—কিন্তু 'চাকর স্বরূপে'। এখন কোন শোক নাই, দুঃখ নাই। বিশ্বস্ত চাকর যেমনটা যত্নের সহিত খাটে ঠিক সেই ভাবেই খাটিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অনাশক্ত ভাবে। ইতিমধ্যে গুরু চলিয়া গেলেন। ১২ বৎসর পর আবার রাজ্যে আসিলেন। আসিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা, এখন কাজকর্ম্ম কেমন চলিতেছে? রাজত্ব কেমন লাগে?" রাজা বলিলেন, "গুরুদেব, এখন বেশ আছি। কোন ভয় ভাবনা নাই, শোক দুঃখ নাই, ভোগাশক্তি শূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে খাটিতেছি। এই রাজত্ব আপনার, আমি মাত্র চাকর স্বরূপে কাজকর্ম্ম করিতেছি।

হে পুত্র, ঠিক এই ভাবে সমস্ত সংসার ভগবান্‌কে দান করিয়া তাঁহার চাকর (ম্যানেজার) স্বরূপে খাটিতে থাক, শোক, দুঃখ, হর্ষ-বিষাদে অভিভূত হইবে না।

ঈশ্বরে নির্ভর।

দেখ, ছোট ছোট শিশু সন্তান পিতামাতা ভিন্ন কিছুই জানে না। খাওয়া পরার যখন যাহা প্রয়োজন তাঁহাদের নিকটই চায়, তাঁহারাও ছেলের সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া দেন, তদ্বৎ যে জন গুরু বা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে গুরু বা ঈশ্বর তাঁহার সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া দেন, তুমি ঈশ্বরকে যে ভাবে ডাকিবে ঈশ্বরও ঠিক সেই ভাবেই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

তিনটি।

সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করিতে হইলে এই তিনটী উপদেশ সর্ব্বদা মানিয়া চলিবে।

(১) পরের মনে আঘাত দিও না।

(২) পরদ্রব্য অপহরণ করিও না।

(৩) স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনায় দান করিও।

ব্রহ্মভূত অবস্থায় ভক্তির প্রকার।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষ মদ্ভক্তিং লভতে পরাম॥

ব্রহ্মভূত অবস্থায় ভক্তি থাকা কিরূপে সম্ভব? দেখ,—যাহাকে বিবাহ করা যায় সে কন্যাটী বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃকূলে থাকিতে তাহার সহিত স্বামীর একগোত্র ছিল না। সম্প্রদান বাক্যের পরই স্বগোত্র হইল। এখন কি সে মেয়ে পুরুষ হইয়া গেল?—সে-ত মেয়েই রহিল। তখন স্বামীর মনোবৃত্তির সর্ব্বানুকূল্য করিয়া সেবা করিতে থাকে। তখন উভয়ে একই বৃত্তি লাভ করিতেছে। তদ্রূপ জীব অবিদ্যার আশ্রয় রূপ গোত্র হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-গোত্র লাভ করিল। অর্থাৎ ব্রহ্মসহ সমগোত্র হইল। কিন্তু উপাসকত্ব-ভাবরূপ নিজ প্রকৃতি ত্যাগ না করায় ব্রহ্মসহ স-গোত্রতা লাভ করিয়াও উপাসনা চলিতে থাকে।

'গুরু' অর্থ কি?

গুরু শব্দার্থ বহু ওজনদার বস্তু;—যেমন লোহা। লোহার নেহাইএর উপর স্বচ হইতে কটাহ পর্য্যন্ত নানা দ্রব্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু নেহাই অপরিবর্ত্তিত অবস্থায়ই আছে। তদ্রূপ কুটস্থ চৈতন্যই গুরু; এই কুটস্থের লক্ষণ কি?—সামীপ্য, উদাসীনত্ব ও স্ব-প্রকাশত্ব। এই কুটস্থ চৈতন্য সকলেরই সমীপে (স্পর্শ যুক্ত অবস্থায়) আছে। ইনি নির্লিপ্ত এবং স্ব-প্রকাশ। যেমন দুইটী মল্ল পরস্পর লড়াই কর্‌ছে। অদূরে একটী অশ্বথ বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। মল্লদ্বয় যখন পরস্পর আক্রমণে উদ্যত তখন তাহাদের লক্ষণে চেতনত্ব ও সামীপ্য আছে। কিন্তু উদাসীনতা নাই। আবার যখন উহারা পরস্পরের প্রতি আক্রমণে অনুদ্যত তখন উহাদের

লক্ষণ চেতনত্ব ও উদাসীনতা, কিন্তু সামীপ্য নাই। বৃক্ষেতে সামীপ্য ও উদাসীনতা আছে। কিন্তু স্ব-প্রকাশত্ব নাই। তদ্রূপ জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় চেতনত্ব ও সামীপ্য আছে—উদাসীনতা নাই। সুষুপ্তি অবস্থায় উদাসীনতা ও সামীপ্য আছে, কিন্তু স্ব-প্রকাশত্ব নাই। এই তিন অবস্থার অতীত,—পরন্তু এই তিন অবস্থার সাক্ষী স্বরূপ যিনি—তিনিই কূটস্থ। উহাতে সামীপ্য, স্বপ্রকাশত্ব ও উদাসীনত্ব বর্ত্তমান ; ইনিই 'গুরু'।

প্রঃ—যদি ইনিই গুরু হন, তবে উপাস্য—উপাসক, গুরু—শিষ্য দুই ভাব থাকে কিরূপে ?

উঃ—এই কূটস্থ অবস্থায় গেলে এই ভেদ থাকে না। কিন্তু যেমন মাটীর ভাণ্ডের মধ্যে বাতি থাকিলে সেই বাতি কিছু প্রকাশ করে না, কিন্তু কাঁচের ভাণ্ডের মধ্যে থাকিলে তাহা নিজকেও প্রকাশ করে এবং কাচের মধ্য দিয়া অন্যকেও প্রকাশ করে, তদ্বৎ যেখানেই প্রকাশ্য প্রকাশক আছে, সেখানেই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় সহিত বর্ত্তমান অবস্থা আছে।

অক্ষয় পুরুষ ও পুরুষোত্তম।

কূটস্থ অবস্থায় যাইতে যিনি নিজের উপাসক বুদ্ধি লইয়া যান তিনি পরাভক্তি যুক্ত হইয়া নিজেই উপাসক থাকিয়া যান। সেই জন্যই কূটস্থ চৈতন্য পুরুষোত্তমরূপে উপাসকের নিকট প্রকাশিত হন। ইহা পরাভক্তির সামর্থ্য। পরাভক্তিতে উপাস্য উপাসক ভেদ আবার যোগমায়া যুক্ত হইয়াই সেই অখণ্ড বস্তু 'একোহহং বহুস্যাম' হইয়াছেন। এই ক্ষমতা যোগমায়া বা স্ব-বিদ্যা শক্তি দ্বারাই হয়, এই অন্তঃকরণ বৃত্তি থাকাতেই পরাভক্তির ভজন-ক্রিয়া সম্ভব হয়। ভক্তির ভজনটা ত একরূপ ব্যাপারই বটে—তাহা অন্তঃকরণ থাকিলেই সম্ভব হয়।

গুরু-শিষ্য।

কো বা গুরু—যো হিতোপদেষ্টা।
শিষ্যস্তু কো বা গুরুভক্তিযুক্তঃ।

হিতোপদেষ্টাই গুরু—গুরুভক্তিমন্তই শিষ্য। এস্থলে 'হিত' বস্তুটী কি? স্ত্রী, পুত্র, টাকা, পয়সা, মান, সম্মান প্রাপ্তিই কি জীবের প্রকৃত হিত? প্রকৃত হিত কি তাহা গুরুভক্তিমান নিকটই প্রকাশিত হয়। যেমন অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন :—

কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ।
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতাঃ॥
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

তখনই গুরুভাবে কৃষ্ণের নিকট শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বহুবার কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জ্জুনের দেখা সাক্ষাৎ কথোপকথন হইয়াছিল। কিন্তু কৈ কখনও ত গীতার ন্যায় বস্তু এতৎপূর্ব্বে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয় নাই।

মাতা চায় ছেলে দুধ খাইয়া হাত পা নাড়ুক। কিন্তু কি করে, ছেলের সান্নিপাত বিকার—দুধ টিপিয়া মুখে দিলেও ছেলে গিলিতে পারে না। মা কি করেন, বসিয়া ছেলের দুর্দ্দশায় কাঁদছেন। তেমনই সদ্গুরুর মহা করুণা মাই দুধে ভরা—টিপিয়া টিপিয়া দেন। কিন্তু ছেলে যে গিলিতে পারে না। সে জন্য দুঃখে কাঁদছেন। অধিকারী না হ'তে কি কুমারী কন্যার গর্ভ হয়? আবার পরমপদ চায় কে? কেহ চায় আমার ব্যারাম ভাল হউক, কেহ বলে আমার দেনার কি করিব? কেহ চায় আমার কন্যার বিবাহ কোথা দিবে—কি ক'রে দিবে? সদগুরু কি করেন?

প্রসাদের গুণ।

প্রঃ—সাধু মহাপুরুষের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজনে নাকি দিব্যজ্ঞান জন্মে। আশ্রমে থাকিয়া রোজ রোজ কত প্রসাদ পাইতেছি,—কৈ, তদ্রূপ জ্ঞান জন্মিতেছে না কেন?

স্বামীজী:—কাপড়ে ধুলা লাগিলে জল দ্বারা ধৌত করিলেই পরিষ্কার হয়, কিন্তু আলকাতরা লাগিলে সহজে পরিষ্কার হয় না। অন্য মসল্লার প্রয়োজন হয়। তদ্রূপ তোমাদের আলকাতরা রূপ কঠিন পাপ ময়লা লাগিয়া আছে—তাহা পরিষ্কার করিতে হইলে অন্য মসল্লা—জপতপাদির প্রয়োজন। তবে প্রসাদের কি কোন গুণ নাই? হাঁ, অবশ্যই আছে। এই যে তোমাদের জপ তপাদিতে প্রবৃত্তি হইতেছে ইহাই প্রসাদের গুণ।

বৃক্ষ ছেদনে পাপ হয় কিনা।

প্রঃ—বৃক্ষাদির প্রাণ আছে, তবে আমরা যে অন্ন ভক্ষণ করি, তাহাতে কি প্রাণী হত্যার পাপ হয় না?

স্বামীজী:—হাঁ, হয় বই কি? পাপ হয়, তবে প্রত্যহ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য ঢেকি, ঝাটা, যাঁতা, উনুন, জল, এই সমস্ত নিত্য ব্যবহার দরুণ যে দশমাংশ দান রূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারাই উক্ত পাপ বিনষ্ট হয়। উহা পঞ্চসুনা পাপের অন্তর্গত। কিন্তু মৎস্যাদি আহার জনিত পাপ ঐ ভাবে নষ্ট হয় না। কারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ মৎস্যের কোন প্রয়োজন নাই।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিধি।

ব্যোমে কত কীট পতঙ্গাদি জন্মিতেছে, জলে মৎস্য পোকাদি কত জলজন্তু উৎপন্ন হইতেছে, মাটী হইতে কত গাছপালা লতা উঠিতেছে, এসব কোথা হইতে আসিতেছে? একমাত্র সেই ব্রহ্ম হইতেই সব উৎপন্ন হইতেছে।

ভক্তি তিন কৃপা-সাপেক্ষ।

(১) আত্ম-কৃপা; (২) গুরু-কৃপা; (৩) শাস্ত্র-কৃপা। যেমন—কালী কলম, কাগজ একত্র হইলেই লিখনরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, ইহার একটীর অভাব হইলেও কার্য্য হয় না। তদ্বৎ আত্ম-কৃপা, গুরু-কৃপা, শাস্ত্র-কৃপা একত্র হইলেই কাজ হয়। আত্ম-কৃপা অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা হইলেই লোক গুরুর নিকট যায়, গুরু শাস্ত্রানুযায়ী শিষ্যকে উপদেশ দেন। তখন ঐ উপদেশানুযায়ী শিষ্য চলিলেই ভক্তি লাভ হয়।

তীর্থ পর্য্যটনে খরচ।

তীর্থ পর্য্যটনের খরচ যে বহন করে সেই বেশীর ভাগ ফল প্রাপ্ত হয়, যিনি পরের খরচে পর্য্যটন করেন তিনি মুজুরী স্বরূপ /০ এক আনা কি ৴১০ দুই পয়সা মাত্র পান।

ভজনে মন যায় না কেন?

লোক কত কষ্ট ক'রে,—ভিক্ষা করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করে,—কত অনুরাগের সহিত তাহা আয়ত্ত করিয়া তবে সুখের মুখ দেখে। কিন্তু

আধ্যাত্মিক বিষয়ে তদ্রূপ পরিশ্রম ও অনুরাগ কোথায়? সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম বিষয়ে অত সহজে মন বসবে কেন? এত পরিশ্রম করিয়া এত খাটুনি খাটিয়া অত অর্থ ব্যয় করিয়া যে বিদ্যা অর্জ্জন করা যায় তদ্‌বিনিময়ে ২০৲। ৫০৲। ১০০৲। ১২৫৲ টাকা—না হয় হাজার টাকা উপার্জ্জনের ক্ষমতা জন্মিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জনের জন্য কি পরিশ্রম—কি অধ্যবসায় কর? কিছুই কর না; অথচ আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে চাও।

পঞ্চভৃত্যের মনিব।

বড় লোকের ন্যায় তোমাদের প্রত্যেকের ৫ জন করিয়া চাকর সর্ব্বদাই খাটিতেছে :

(১)	পাখাওয়ালা—	যথা—	প্রাণবায়ু
(২)	মেথর—	,,	অপানবায়ু
(৩)	মালি—	,,	সমানবায়ু
(৪)	বেহারা—	,,	ব্যানবায়ু
(৫)	দারোয়ান—	,,	উদানবায়ু

অদ্বৈত মতে পূজা সম্ভব কিনা।

অদ্বৈত মতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য সত্ত্বেও পূজা অর্চ্চনা সম্ভব হয়। ব্যবহার সত্ত্বায় পূজা অর্চ্চনা অবশ্য থাকিবে। তুমি তোমার মুখ ধোও, নিজে বাহ্য প্রস্রাব কর, যদি নিজের কোন কর্ম্ম না থাকে তবে পূজা

অর্চ্চনাও নাই। সুষুপ্তি অবস্থায় কিছুই থাকে না। যতক্ষণ নিজের পৃথক অস্তিত্ব জ্ঞান আছে, ততক্ষণ ঈশ্বর ভগবানের পূজাও আছে। শঙ্করাচার্য্য মহারাজও পূজা অর্চ্চনা করিতেন। নিজে নিষ্কর্ম্মা হও—তা হ'লে কোন কর্ম্মই থাকবে না। নতুবা অহং ব্রহ্মাস্মি বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন ?

নির্জ্জনতা ভিতরের জিনিষ।

১৩৩৩ সনের কুম্ভমেলার সময় একদিন ঠাকুর বিরাট জনতার ভিতর দিয়া চলিয়াছেন, বিপুল জন-কোলাহল শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, এসব জন-বহুলতাকে বন বলিয়া মনে করিবে, বনে চলিলে যেমন বহু বৃক্ষাদি দেখা যায়, কিন্তু তাহা কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করে না, তদ্বৎ এই যে লোকে লোকারণ্য তাহার প্রত্যেককে এক একটী বৃক্ষ সদৃশ মনে করিয়া নিজের ভাবে চলিবে। নির্জ্জনতা বাহিরে নয়, নির্জ্জনতা ভিতরের জিনিষ। ভিতরে নির্জ্জন হইলেই নির্জ্জন। বাহিরের কোলাহল কিছুই করিতে পারে না, যদি ভিতরে নির্জ্জন হওয়া যায়।

জীব সদাই সৎ, চিৎ, আনন্দময়।

দেখ, শিশু শু'য়ে শু'য়ে হাত পা নাড়িয়া কেমন আনন্দ করে। সে কি পাইয়া এত আনন্দ করে ? তাহার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, বিত্ত সম্পত্তি কিছুই নাই, তবুও সে কেমন আনন্দময়। কেন সে এরূপ হয় ? তাহার

ভিতরে সচ্চিদানন্দ বিশেষভাবে জাগ্রত আছে। ক্রমে যতই সে বড় হইতে লাগিল ততই ঐভাব চাপা পড়িতে লাগিল, মাটীর নীচে জল আছে, কিন্তু পায়ে জল লাগিতেছে না, মাটী বাধা দিতেছে। ঐ মাটীর বন্ধন ছুটিয়া গেলেই জলের নাগাল পাওয়া যায়। তদ্রূপ ঐ আনন্দ পাওয়ার যে সব বিঘ্ন আছে তাহা অপসারিত হইলেত সচ্চিদানন্দের অনুভূতি জন্মিবে। সাধন ভজন জপ তপ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করতঃ সেই প্রতিবন্ধক উঠাইয়া ফেল।



ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা।

বরফের টুকরা, উহার গুণ কঠিনত্ব, শীতলত্ব, গোলাকৃতি ও শ্বেতত্ব; তাহা জল হইতে পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু অগ্নির নিকট ধরিলে দেখা যায় উহা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তদ্বৎ জীবাত্মা বহুগুণ বিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া দেখা যায়; উহা কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বটে,-- অন্য কিছুই নহে।



সঙ্গ দোষ।

ড্রেইনের নিকট দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে, ড্রেইনের জল অস্পৃশ্য, অপবিত্র কিন্তু গঙ্গাজল শুদ্ধ পবিত্র। কেন এরূপ হইল?—সঙ্গ দোষ। উভয়ের মধ্যে একই জল। একটী নিঃসঙ্গ হইয়া পবিত্র আছে, অপরটী সঙ্গ দোষে দূষিত ও অপবিত্র হইয়া আছে, তদ্বৎ জীবাত্মা পিতামাতার শুক্র শোণিত সংস্পর্শে অপবিত্র, অস্পৃশ্য, আর পরমাত্মা শুদ্ধ—বুদ্ধ—মুক্ত।

জীবের অবস্থা।

আগে পাছে সৈন্য সামন্ত, গাড়া, ঘোড়া, হাতী,—খুব জাকজমকে রাজপোষাকে সাজাইয়া একটী লোককে লাট সাহেব স্বয়ং মটর চালক হইয়া লইয়া যাইতেছে; লোকটি আনন্দে আত্ম-হারা, কিন্তু হায়, সে জানে না যে ঐ বেশে তাহাকে ফাঁসি দিতে নিতেছে। হে জীব, তুমিও তদ্রূপ চলিয়াছ; বৃথা মান, অভিমান, রঙ্গ-তামাসা। ঐ যে ফাঁসি কাষ্ঠ নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

কুকুরের চারি দোষ।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে এক সাধু একদা এক কুকুরকে আঘাত করাতে সে সাধুর বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের নিকট নালিশ করিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিচার সভা বসিল। রামচন্দ্র, কি দোষে কুকুরকে মারিয়াছে তাহা সাধুকে জিজ্ঞাসা করায় সাধু বলিল, "কুকুরের চারিটী দোষের জন্য মারিয়াছি।"

১ম দোষ—শেষ রাত্রে ঘুমায়।

২য় ,, —পথে ঘুমায়।

৩য় ,, —উর্দ্ধ স্থানে প্রস্রাব করে।

৪র্থ ,, —লোক দেখিলে ঘেউ ঘেউ করে।

রামচন্দ্র কুকুরকে তাহার উক্ত দোষ চতুষ্টয়ের কি উত্তর আছে জিজ্ঞাসা করায় কুকুর উত্তর করিল:—

১ম দোষের উত্তর—আমি গৃহস্থের বাড়ী থাকি, তাহার প্রদত্ত খাদ্যে জীবন ধারণ করি, সে যখন ঘুমাইয়া থাকে তখন বাড়ীতে চোর ঢুকে, এই

আশঙ্কায় সারারাত্রি জাগিয়া পাহারা দেই। রাত্রি শেষে যখন গৃহস্থের ঘুম হইতে উঠিবার সময় হয় তখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাই।

২য় দোষের উত্তর—আমি জাতিতে পশুর অধম,—কুকুর। সাধুগণ আমাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না, তজ্জন্য আমি পথে শুইয়া থাকি। সাধু সন্ত ব্যক্তি পথ চলিতে চলিতে যদি দৈবক্রমে তাঁহাদের পদধূলি আমার দেহে পতিত হয়।

৩য় দোষের উত্তর ঃ—একেই আমার অপবিত্র দেহ, তদুপরি এই দেহ নিসৃত প্রস্রাব কত অপবিত্র! সমতল স্থানে প্রস্রাব করিলে পাছে সাধু সন্তগণের চরণে ঐ প্রস্রাব স্পর্শ হয় এই ভয়ে উচ্চস্থানে বৃক্ষাদিতে প্রস্রাব করিয়া থাকি।

৪র্থ দোষের উত্তর ঃ—আমি চতুষ্পদ জন্তু, হিতাহিত জ্ঞান নাই; কিন্তু দ্বিপদ জীব মানুষের সে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাহারা কেন কেবল আহার, নিদ্রা, মৈথুন নিয়া পশুবৎ আচরণ করিতেছে তজ্জন্য তাহাদিগকে দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করিয়া থাকি।

রামচন্দ্র কুকুরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া সাধুকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং সাধুর কি শাস্তি হইতে পারে তাহা নিজে কিছুই না বলিয়া তাহা স্থির করিবার জন্য কুকুরকেই বলিলেন।

কুকুর বলিল,—"ঐ সাধুকে চারিধামের পাণ্ডা করিয়া দিন।"

তাহাতে সাধুর সাজা কি হইল? পাণ্ডারা ঠাকুরের দুয়ারে বসিয়া ঠাকুরের দিকে পিছন দিয়া এবং যাত্রিক লোকের দিকে মুখ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, অর্থাৎ তাহারা ভগবান বিমুখী ও বহির্মুখী হইবে।

সাধনে নিরাশ হইও না।

প্রঃ —নাম করিয়া যখন কোন ফল দেখি না তখন অত্যন্ত নিরাশা আসিয়া পড়ে, নাম ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

স্বামীজী :—সাধন করিতে কখনও নিরাশ হইও না। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। যতই সাধন কর, পূর্ব্ব-সঞ্চিত পাপ ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে। দেখ, এক ব্রাহ্মণ ২৫বার গায়ত্রী পুরশ্চরণ করিয়াছিল। ২৩ বার যখন করিল তখন হতাশ হইয়া নিজ গুরুর নিকট গিয়া বলিল, "গুরুদেব, ২৩ বার পর্য্যন্ত পুরশ্চরণ করিলাম, কিছুই হইল না, আর করিতে ইচ্ছা হয় না।" গুরু তখন শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ, নিরাশ হইও না, তোমার ভজন পথে আরো ২টী পাপরূপী পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আরো ২বার তোমার কর্ম্ম করিতে হইবে। শিষ্য তখন বুক বান্ধিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। যখন আরো দুইবার—২৫বার পুরশ্চরণ করিয়াছে—তখন তাহার গায়ত্রী সিদ্ধি হইল। তাই বলি, সাধনে কখনও নিরাশ হইও না।

পরমাত্মার পরিচয়।

সরোবরে পদ্মফুল ফুটিয়া শোভা পাইতেছে। এক ব্যক্তি উহা দেখিয়া ঐগুলি কি বুঝিতে না পারিয়া তাহার পরিচয় পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রথমতঃ ভেকের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'বন্ধুবর, ঐ যে সুন্দর কি দেখা যাইতেছে ঐগুলি কি পদার্থ ?" ভেক বলিল, "ঐগুলি কিছুই নহে, উহাতে কেবল প্যাঁক (কর্দ্দম),

কাঁটা, আর নাল। তুমি উহার জন্য এত পাগল হইয়াছ কেন?" পথিকের মনে ধাক্কা লাগিল; দেখ্‌তে সুন্দর ফুলের মত, অথচ সাক্ষী বলে কি? অতঃপর ঐ ব্যক্তি কচ্ছপের নিকট গেল এবং তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। ভেক যাহা বলিয়াছিল কচ্ছপও ঠিক তাহাই বলিল। তৃতীয় বার সে মাছের নিকট গেল। মাছকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে মিত্র, ঐ যে ফুলের মত কি ফুটিয়া আছে, ঐগুলি কি পদার্থ? তুমিত উহার সহিত একত্রে জলে বাস কর, তুমি নিশ্চয়ই উহার পরিচয় জান।" মাছ বলিল, "ঐগুলি কেবল পাঁক, কাঁটা ও নাল বই আর কিছুই নাহে; তবুও পথিকের সন্দেহ যায় না। এক ভ্রমর ঐ পথ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে ঐ বিষয় প্রশ্ন করিল। ভ্রমর পথিকের প্রশ্ন শুনিয়া "যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এইমাত্র বলিয়া চুপ করিয়া পদ্মের ভিতর ঢুকিয়া গেল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। তখন পথিক বুঝিল উহা অমূল্য পদার্থ। পথিক জলে নামিল, কোচর পুরিয়া প্রচুর পদ্মফুল তুলিয়া আনিল ও অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

হে হরিজন! তোমরাও পরমাত্মার বিষয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছ, সদ্‌গুরুরূপী ভ্রমরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছ না। পরমাত্মার প্রকৃত পরিচয় সদ্‌গুরুই দিতে পারেন।

অন্তকালের চিন্তা।

প্রঃ। শাস্ত্রে আছে অন্তকালে যে যেভাবে যে চিন্তা নিয়ে মরে পরজন্মে সে সেই ভাবযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়। যদি তাহাই সত্য হয় তবে কেহ যদি সারাজীবন দুষ্কর্ম্ম করিয়া শেষ সময় সৎ-চিন্তা করে, গুরুর

ধ্যান করিয়া মরে তাহা হইলে তাহার কি পূর্ব্বকৃত সব পাপ নষ্ট হইয়া ঐ ধ্যানের ফল প্রাপ্ত হইবে ?

স্বামীজী :—দেখ, মুলা খাইলে মুলার ঢেকুর উঠে, রসুন খাইলে রসুনের ঢেকুর উঠে। রসুন খাইয়া কেহ সন্দেশ রসগোল্লার ঢেকুর উঠা আশা করিতে পারে না। তদ্বৎ যে সারাজীবন যেভাবে কাজ করিবে মৃত্যু সময়ে তদ্বৎ ভাবই আসিবে, ব্যতিক্রম হইবে না।

স্ব-ধর্ম্ম নির্ণয়।

প্রঃ। জন্ম হিসাবে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয় তদনুসারেই কি তাহার স্ব-ধর্ম্ম নির্ণয় হইবে ?

স্বামীজী—তাহা হইতে পারে না ; যে ভাবে কর্ম্ম করিবে সে ভাবেই তাহার জাতি নির্ণয় হইবে। জাতি হিসাবে শূদ্র ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিলে সে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। শুধু জন্মদ্বারাই জাতি নির্ণয় হয় না। শুক্র-শোণিতে জন্ম হয়। ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধার পুত্র হইয়া (শুক্রের প্রাবল্যে) ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিল, আর ঐ ব্যাসদেবই চিত্র বিচিত্র বীর্য্যের পিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ না হইয়া (শোণিতের প্রাবল্যে) ক্ষত্রিয় হইলেন। বশিষ্ঠ ঋষি বেশ্যাপুত্র ছিলেন ; এখন দেখা যাইতেছে শুধু জন্ম দ্বারা জাতি নির্ণয় না হইয়া কর্ম্ম দ্বারাই হয়। পরন্তু কর্ম্ম করিতে করিতে এই জন্মেই শূদ্রত্ব হইতে বৈশ্যত্ব, ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়।

জহরীই জহর চিনে।

এক দরিদ্র শিষ্যের একান্ত কাকুতিতে গুরু তাহাকে এক মণি দিলেন। শিষ্য মণি লইয়া বাজার করিতে গেল। প্রথমতঃ সে আটার দোকানে গেল, মণির বিনিময়ে কিছু আটা চাহিল; দোকানী মণি ফিরাইয়া দিয়া বলিল উহা এক টুকরা পাথর মাত্র, উহার কোন মূল্যই নাই; তাহা রাখিয়া সে আটা দিতে পারিবে না। এভাবে যার নিকট যায় সে-ই মণি ফিরাইয়া দেয়, এমন কি শাকওয়ালী উহা রাখিয়া এক পয়সার শাক পর্য্যন্তও দিল না। শিষ্য বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া গেল। রাত্রে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "গুরুদেব, আপনি আমাকে কি একটা জিনিষ দিয়াছেন তাহা রাখিয়া কেহই কোন জিনিষ দিতে চায় না, এমন কি তদ্‌বিনিময়ে এক পয়সার শাক পর্য্যন্তও মিলিল না।" গুরুদেব তখন বলিলেন, "অমুক জহরীর নিকট লইয়া যাও।" শিষ্য পরদিন প্রাতে উক্ত জহরীর নিকট মণি উপস্থিত করিল, জহরী উহা আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে এমন মণি কোথায় মিলিল! জহরী বলিল, "এমন বস্তুটী স্পর্শ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।" তদ্বৎ তোমরা গুরু-দত্ত জিনিষ দশ ইন্দ্রিয়ের নিকট লইয়া যাইতেছ, উহারা উহা তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া ফিরাইয়া দিতেছে। কিন্তু যদি একবার সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার নিকট উপস্থিত করিতে পার তবেই বুঝিবে উহা কি পদার্থ—উহার মূল্যইবা কত।

কিভাবে আহার করিবে

খুব প্রসন্ন মনে ধীরে ধীরে খুসীর সহিত ভগবানের নাম করিতে করিতে আহার করিবে, তবেই ঐ অন্ন-রস শরীরের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিবে।

———

চৌরাশি লক্ষ যোনির রসাস্বাদ।

এক জহরী কোন এক রাজবাটীতে হার বিক্রয় করিতে গিয়া রাণীর দৃষ্টিতে পড়িয়া গেল। রাণী তাহাকে ডাকিয়া নিয়া তাহার সহিত ভালবাসা স্থাপন করিল। রাজা একদিন হঠাৎ অসময়ে রাজ দরবার হইতে অন্তঃপুরে আসিয়া পড়িলেন।

জহরী রাজাকে দেখিয়াই ভয়ে কম্পমান হইয়া রাণীকে বলিল, "রাণী, আমার প্রাণ রক্ষা কর, রাজা দেখিলে আমাদের দুইজনেরই মস্তক ছেদন করিবে। রাণী কোনও উপায় করিতে না পারিয়া জহরীকে তেতালার পায়খানা ঘরে পাঠাইয়া দিল, এদিকে রাজা আসিতেই রাণী তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক ঘরে টানিয়া আনিতে উপক্রম করিল। কিন্তু রাজা বলিলেন, 'আমার পায়খানার বেগ হইয়াছে', ইহা বলিয়াই দাসীকে জল আনিতে হুকুম করিলেন। দাসী জল দিতে গিয়া জহরীকে বলিল, 'রাজা পায়খানায় আসিতেছেন', জহরী প্রাণ-ভয়ে পায়খানার নাল দিয়া নীচের দিকে নামিয়া পড়িল। রাজা আসিয়া তাহার মস্তক উপরেই মলমূত্র ত্যাগ করিলেন। এই সমস্ত দুর্গন্ধময় মলমূত্রবাহী রস জহরীর নাকে মুখে প্রবেশ করিল। পরদিন প্রাতে মেথর আসিলে রাণী মেথরের নিকট এক চিঠি লিখিয়া দিলেন যে তাহাদের দুইজনের প্রাণ তাহার হাতে, ঐ ব্যক্তিকে প্রকাশ করিলে রাজা দুইজনেরই মস্তক ছেদন করিবেন। মেথর চিঠি পাইয়া জহরীকে ছাড়িয়া দিল। এখন বল দেখি, রাণী যদি পুনরায় জহরীকে ডাকে সে যাবে কি না? তদ্বৎ তোমরা ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য জন্ম পাইয়াছ। গর্ভে মাতার মল-মূত্র আমাদের সর্ব্বাঙ্গে—গালে, মুখে, চোখে কত লাগিয়াছে। জানিয়াও কি পুনরায় উদর রস আস্বাদ করিতে যাইবে?

৮৪ লক্ষ জন্ম।

১।	জলজ—	৯ লক্ষ
২।	স্থাবর—	২০ লক্ষ
৩।	সরীসৃপ—	১১ লক্ষ
৪।	পক্ষী—	১০ লক্ষ
৫।	চতুষ্পদ—	৩০ লক্ষ
৬।	মানুষ—	৪ লক্ষ
		৮৪ লক্ষ

৪ লক্ষ মনুষ্য জন্মে যদি সদ্‌গুরু না মিলে তবে পুনঃ ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে।

স্বর্গের দ্বার।

১। ভূমিকে প্রণাম।

২। জল-নারায়ণকে প্রণাম।

৩। সূর্য্যদেবকে প্রণাম।

৪। মাতাপিতাকে প্রণাম।

৫। হরি-ভজন।

৬। ভগবৎগীতা পাঠ।

৭। সাধুসঙ্গ।

৮। অতিথি-সৎকার

৯। আয়ের দশমাংশ দান।

নরকের পথ।

১। গালাগালি করা।

২। নিন্দা চুগ্‌লি করা।

৩। ঈর্ষা দ্বেষ করা।

৪। পরদার গমন করা।

৫। মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা।

৬। মদ্য-পান করা।

৭। চুরি করা।

৮। দিব্য করা।

৯। জুয়াখেলা।

প্রশ্নোত্তর।

গুরু কে ?—যিনি উপদেশ দেন।

সিদ্ধ কে ?—যে গুরু-ভক্ত।

পরমতীর্থ কি ?—নিজের বিশুদ্ধ মন।

কোন্ বস্তু হেয় ?—কামিনী কাঞ্চন।

ধনী কে ?—যে সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট।

স্বর্গ কি ?—বাসনা ক্ষয়।

আবদ্ধ কে ?—বিষয়ানুরাগী।

কিসে স্বর্গলাভ হয় ?—জীবের প্রতি অহিংসায়।

সর্ব্বদা কি শ্রবণ করা উচিত ?—গুরুর উপদেশ ও বেদান্ত বাক্য।

স্বামীজী মহারাজের শেষ বাণী।

১। ইয়াদ রাখো 'পাপকা ফল দুখ্, পুন্‌কা ফল সুখ'। (এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ পাপের ফল দুঃখ আর পুণ্যের ফল সুখ)।

২। তোম্ যেইসে দুঃখ পাও এইসা কাম মৎ করো। (তুমি যেইরূপ কাজে দুঃখ পাও সেইরূপ কাজ করিও না)।

চতুর্থ অধ্যায়।

পত্রাবলী।

স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন গুরুভাই-ভগ্নীগণ যে সব পত্রের উত্তর পাইয়াছেন তাহার কতিপয় অনুলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

(১)

হরিদ্বার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ—১৩১০ সন।

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনম্,

বাবা! তোমার পত্র পাইয়া নিম্নে উত্তর প্রদান করিতেছি ; মনোযোগ সহকারে পাঠপূর্ব্বক কাজ করিও, হতাশ হইবার বিষয় কিছু নহে।

বাবা! জন্ম হইতে যে প্রকৃতি বাস্তবিক বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন সংসারে বিচরণ করে, বিশেষ সংগ্রাম করিয়া তবেত তাহাকে স্বচ্ছ করিতে হইবে। লেখা পড়া শিক্ষার সময় কি একক্ষণেই সব আয়ত্ত করিতে পারা যায়? কদাপি নহে। মন দ্বারাই মনকে বাধ্য করিতে হইবে, অতি নির্জ্জনে সরলকায় হইয়া বসিবে, পরে মালার দিকে লক্ষ্য করিয়া শনৈঃ শনৈঃ জপ করিতে থাকিবে। তাহাতে গভীর গবেষণার সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে, বিনা প্রাণায়ামেই প্রাণবায়ু যেন ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিতেছে। প্রাণবায়ু স্থির হইলে মনও স্থির হইয়া পড়িবে। তবে একটু অধিক সময়তক প্রতিদিন জপ

না করিলে ইহার সত্যানুভব করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বিবেচনা করি ক্রমশঃ একমাস কাল প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে ও সায়ংকালে প্রতিবার অন্ততঃ চারিদণ্ড কাল করিয়া সরলভাবে উপবেশনপূর্ব্বক ঠিক মালার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি সংযোগপূর্ব্বক জপ করিতে পারিলে দেখিতে পাইবে জপে বসিবার পূর্ব্বে তোমার প্রাণবায়ু শ্বাস ও প্রশ্বাস দ্বারা যে পরিমাণ প্রবাহিত হইত তাহা হইতে একটু স্থির হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ফল পাইবে এবং তাহা হইলেই তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে প্রবৃত্তি জন্মিবে। বিশ্বাস যোগের এক অঙ্গ। বিশ্বাস করিতে হইবে। জপমালার দিকে দৃষ্টি সংযোগে জপমালা একটী একটী করিয়া ফিরাইতেও মন অন্যত্র চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিবে। তখনই মনকে গুরু-আদেশরূপ অঙ্কুশ দ্বারা পুনঃ মালাতে বসাইবে। এরূপ করিতে করিতে যখন সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইতে থাকিবে তখনই দেখিতে পাইবে স্বকার্য্য ক্রমশঃ আয়ত্ত হইয়া পড়িতেছে। আর দীর্ঘকালব্যাপী বীজমন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেও শরীরস্থ গুণত্রয়ের ক্রমশঃ যেন সাম্যাবস্থা হইয়া পড়িতে থাকে। * *

আশীর্ব্বাদক—

স্বামী ভোলানন্দ গিরি।

(২)

হরিদ্বার, ৬ই জৈষ্ঠ—১৩১২ সন।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। গুরু-দত্ত যে বাক্য পাইয়াছ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করাই জীবনের প্রধান কার্য্য।

মন ডালে ডালে যায় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, মনের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যাইতে দেও, কিন্তু মন যেখানে যাইবে তাহার সম্মুখেই সেইখানে গুরু-দত্ত নাম বা মূর্ত্তি ধরিয়া দিবে। মনকে বদ্ধ করিয়া রাখার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। যখন তিনি সর্ব্বব্যাপী তখন মন ঘরেই থাকুক আর ডালেই থাকুক তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ইহার জন্য কোন ভাবনা নাই। ক্রমে ক্রমে সমস্তই হইয়া যাইবে। এ শরীর ভাল আছে, সকলকে আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

স্বামী ভোলানন্দ গিরি।

(৩)

হরিদ্বার

কল্যাণবরেষু।

* * * তোমার মন চঞ্চল লিখিয়াছ। এই কথা কি ঠিক? চঞ্চল শব্দের অর্থ জানি যে যাহা এক বিষয় ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয় ধরে; যেমন রামচন্দ্র ও অর্জ্জুনের মন চঞ্চল হইয়াছিল। বশিষ্ঠ ও কৃষ্ণজী তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। তোমার মন চঞ্চল কৈ? বিষয়েইত স্থির আটক রহিয়াছ। চঞ্চল হইলে মনে স্বজাতীয় নপুংসক চেতন পদার্থ যে ব্রহ্ম, সে দিকে যাইত। ইতি—

---

(৪)

হরিদ্বার

কল্যাণবরেষু।

* * * গুরু-বাক্য ও উপদেশই মন্ত্র। তাহাতে নিষ্ঠা ও ভক্তি রাখিয়া কর্ম্ম করাকে সাধন ভজন বলে। তন-মন-ধন যদি তোমার হয় পাপ পুণ্যও তোমার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও কর্ম্মফলকে এড়াইতে পারেন নাই। নাম ও দান করিলে যখন পুণ্য হয়, গালি কু-বাক্য-দ্বারা পাপ না হবে কেন? পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা বেদ বিধিতে লিখেছেন কেন? বৎস, তুমি নিজ মনে চিন্তা করিয়া দেখ না কেন?

যখন কোন ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে কলহ করেন তখন উচ্চৈঃস্বরে দৃঢ়তার সহিত "গোবিন্দ, গোবিন্দ," "শিব শিব" এই মাত্র জপ করিবে তাহা হইলে সব গোল সহজেই মিটে যাবে। ইতি—

(৫)

কল্যাণবরেষু,—

সতত নাম করিতে চেষ্টা করিও, সমূহ সংসার আবল্যে আমার উপদেশ মত নিয়মিত মালা সংখ্যা নাম করিতে না পারিলে যেতক পার করিও, কিন্তু পুত্র, সতত চিত্তটী ভগবন্মুখী রাখিও, চল্‌তে ফিরতে সকল সময়েই অবসর মত নাম স্মরণ করিতে পার। কলিকালে জীবের ইহাই পরম জিনিষ। তোমার ছেলে সংসারের ভার নিলে তুমি খুব অবসর পাইবে। হে পুত্র, বিষয়ের দাসত্ব বহুদিন করিয়াছ। এখন ভগবানের দাসত্ব করিতে কটীবদ্ধ হও।

তোমার পূর্ব্ব দীক্ষামন্ত্র সম্বন্ধে সাক্ষাতের উপদেশ মত কাজ করিও। এই জন্য ভীত হইও না। দেখ, পুত্র, শিশু বেলায় যে মাতৃস্তন্য পান করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছ, বড় হইয়া সেই অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বয়সোপযোগী অন্য আহার ধরিয়াছ। সুতরাং তোমার মনে খট্‌কা আসে কেন? কুল-গুরুর প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোনও ক্রুটী করিও না। ইতি—

(৬)

হরিদ্বার

পরম শুভাশীর্ব্বাদ,—

* * * আমার দৃষ্টি সর্ব্বদাই তোমাদের উপর আছে। তোমরা প্রাণপণে আমার আত্মার সহিত জল ও চিনির ন্যায় মিশিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। দান ও নাম একমাত্র উপায় জানিবে * * * তোমরা আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

(৭)

হরিদ্বার
২৮।৬।৩৬

কল্যাণবরেষু,—

* * * গুরুমূর্ত্তি ধ্যান কি দেবমূর্ত্তি ধ্যানে কোন পার্থক্য নাই। গুরুর ফটো পূজায় ভগবানের পূজা হয়। উপাসনা করার সময় কোন দর্শন পাও না, কারণ মন চঞ্চল থাকে। মন স্থির হইলেই দেখিবে আমি উপস্থিত আছি। ইতি—

---

(৮)

হরিদ্বার

ওঁ

একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা
একং মিত্রং ভূপতি বা যতি বা॥
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা।
একা নারী সুন্দরী বা দরী বা॥

কল্যাণবরেষু,—

আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবে।

*   *   *   *   *

পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ। নাম ও দানে মতি রাখিবা। নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

---

(৯)

হরিদ্বার

কল্যাণবরেষু,—

* * * র মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইলাম, ইহাকে অপমৃত্যু বল কেন? শ্রীভগবানের নিয়মানুসারে কেহ বিছানায় শুয়ে মরে; কেহ জলে ডুবে, কেহ সর্পাঘাতে বা অন্য নানা প্রকারে মরে, আত্মাত সুখ-স্বরূপ দেহের ছেদনে আত্মার ছেদন হয় না। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।" প্রারব্ধ অনুসারে দেহের ভোগ হয়। গত জীবনের জন্য অনুশোচনা করিও না। তোমরা তাহার আত্মার মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম পালন কর ও নাম দানে মতি রাখ। গত বিষয়ের জন্য শোক না করিয়া সহ্য কর। ইতি—

---

(১০)

হরিদ্বার

১৯শে ভাদ্র ১৩২৬

কল্যাণবরেষু,—

*　　*　　*　　*　　*

কুলাচার লৌকিক বা ব্যবহারিক, অস্মৎপক্ষের কোন দেবতার দ্বেষ বা রাগ নাই। যে পরিবার যে দেবতার নাম পছন্দ করে তাহা জপ করিলেই হৃদয় শুদ্ধ হওয়ার সহকারী হইবে, তবে সদ্‌গুরু পরমার্থিকের যে সহায় সেইটাও বেদ-স্মৃতি-সম্মত ও আগম বা তন্ত্রেও তাহার নিষেধ নাই।

যদি শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস থাকে তবে নিম্ন শ্লোকগুলিতে "গুরু কে?" তাহা স্পষ্ট আছে, তোমরা ব্রাহ্মণ বলিয়া জাত্যভিমান রাখ. বেদ-ত্যাগী ব্রাহ্মণ পদ-বাচ্য-নহে, এবং বেদকে ত্যাগ করিয়া যে শাস্ত্র বা ধর্ম্মোপদেশ তাহাও গ্রাহ্য নহে, চাই কলিতে, চাই যে কোন যুগে হউক।

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহিতাঃ স্মৃতাঃ॥

মনু ১২।৯৫

যে সকল স্মৃতি বেদবহির্ভূত, যে সকল শাস্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ কুতর্কমূলক, পরলোক সম্বন্ধে সে সমুদয়ই নিষ্ফল জানিবে—সেই সকল শাস্ত্র তমঃ কল্পিত মাত্র।

পৈতাধারী হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ। মনুতে যে চারি আশ্রম উক্ত আছে তার চতুর্থ যতি বা সন্ন্যাস,—যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। সন্ন্যাসী ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ কোথায়? ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে সে ব্রাহ্মণই হয় না।

ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্ট ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতি প্রত্যক্ষ হেতবঃ ॥

মনু ১২অঃ ১০১

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরোধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাম্ জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাম্ পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥

মনু ১২অঃ ১১৩।১১৪

যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞত্বাদি জন্য ধর্ম্মের আশ্রয় তাঁহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। তাঁহারাই শ্রুতিদ্রষ্টা ঋষি।

একজন মাত্র ব্রহ্মবিদ্ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা করেন তাহাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, দশ হাজার অজ্ঞ বলিলেও তাহা ধর্ম্ম হয় না। যাহাদের ব্রত নাই, মন্ত্র নাই, জাতিমাত্র ব্রাহ্মণোপজীবী তাহাদের হাজার হাজার সমবেত হইলেও পরিষৎ হয় না।

যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়ালোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

মনু ৬ অঃ ৩৯।-

যিনি সর্ব্বভূতে অভয়দান করিয়া গৃহ হইতে প্রবজ্যা করেন ব্রহ্মবাদী সেই ব্যক্তি তেজোময় লোক সকল লাভ করেন।

ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব গৃহস্থৈরেব সেবিতাঃ।
বিদ্যাতপো বিবৃদ্ধ্যর্থং শরীরস্য চ শুদ্ধয়ে ॥

মনু ৬ অঃ ৩০

ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ, পরিব্রাজক ব্রাহ্মণগণ, এমনকি গৃহস্থেরাও আত্মজ্ঞান, তপস্যাবৃদ্ধি এবং শরীর শুদ্ধির জন্য উপনিষদাদি শ্রুতিরই সেবা করিয়া থাকেন।

যদি গৃহস্থের সন্ন্যাসীর নিকট যাওয়া নিষেধ হয় তবে বনে সন্ন্যাসী সেবার প্রয়োজন ? আর সর্ব্বজীবে যে অভয় দিবেন তাই বা গৃহস্থ বর্জ্জন করিয়া হয় কিরূপে ?

শ্রীমদ্ভাগবত।

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়মুত্তমং।
শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়েৎ॥

একারণ একান্ত মঙ্গল জানিতে অভিলাষী যে জিজ্ঞাসু সে শব্দ ব্রহ্ম (বেদ) তত্ত্বজ্ঞ ও পরব্রহ্ম অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা জ্ঞাত তাঁহাকেই গুরু করিবে।

১১শ স্কন্ধ ৩ অধ্যায়।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ॥

গীতা ৪ অঃ ৩৪

পরব্রহ্মকে তত্ত্বজ্ঞ যে দর্শন করিয়াছে সেই জ্ঞানীকে প্রণিপাতাদি প্রশ্ন করিলে তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

শ্রুতি বলেন ঃ—গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং (মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম খণ্ড)।

ব্রহ্মনিষ্ঠ—বেদ পারদর্শীকে গুরু করিয়া সমিধের কাষ্ঠভার হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে।

ভগবান্ কৃষ্ণজীর গুরু দুর্ব্বাসা সন্ন্যাসী ছিলেন। কৃষ্ণজী গৃহস্থ। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত রামানন্দ রায়, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি সন্ন্যাসী মহাপ্রভু হইতে দীক্ষা নিয়া গৃহস্থই ছিলেন।

৺কাশীধামের ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গুরু পরমহংসজী ও

রামকৃষ্ণ পরমহংসজীর গুরু তোতাপুরী, ধুনী পাহাড়ের ঠাকুরদাস বাবা, শিবনারায়ণ স্বামী, গোরক্ষপুরের গম্ভীরানাথজী পওহারী বাবা, ইহারা সকলেই সন্ন্যাসী, ইহাদের বহু গৃহস্থ শিষ্য আছে। এমতাবস্থায় বলিতে হয় যে এই সকল মহাপুরুষগণ সকলেই শাস্ত্র-বাক্য লঙ্ঘনকারী মহাপাপী, নতুবা কেমন করিয়া গৃহস্থ শিষ্য করিল? বেদ মনু প্রভৃতি সমস্বরে যাহা বলেন তৎবাক্যের অন্যথায় যদি কোথাও কোন তন্ত্রে গৃহস্থের গুরু গৃহস্থই হইবে এমন আদেশ থাকে তাহা প্রামাণ্য নহে।

আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবে ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

স্বামী ভোলানন্দ গিরি।

(১১)

হরিদ্বার—

২৭।৭।২৪

কল্যাণবরেষু,

আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবা।

তীর্থ মাহাত্ম্য আছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হও, ৺ কাশী, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য বহু শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। জপ না করিয়া শুধু তীর্থে গমনেরই যথেষ্ট ফল আছে। জপাদিরত কথাই নাই। যেমন চন্দ্রগ্রহণে কাশী ও সূর্য্য গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে গমন, গ্রহণ কালীন জপ পুরশ্চরণ আদি করার জন্য। এজন্য লক্ষ লক্ষ লোক ঐ সময় উক্ত তীর্থে গমন করেন। তীর্থের তীর্থত্ব কি, তাহা বুঝিলেই

তীর্থে জপাদির মহিমা হৃদগত হয়। যেখানে সাধনের অনুকূল সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রালাপ, দেব-সেবাদি সর্ব্বদা সম্ভবপর তাহাই তীর্থ। সৎসঙ্গের অপার মহিমা। সৎসঙ্গে স্থানেরও মহিমা। সাধুর আবহাওয়ায় তীর্থ মহিমান্বিত হন। সাধনকালে ঐ সকল স্থলে সত্ত্বগুণ বিকাশ ও রজঃতম অভিভূত করার উপযোগী বিজলী সঞ্চিত থাকে। দেখ, কৃষ্ণ উদ্ধবকে সন্ন্যাস নিয়া বদ্রীনাথ যাইতে উপদেশ করেন। জাবালাদি উপনিষদেও কাশী, কুরুক্ষেত্রের মহিমা দৃষ্ট হয়। যদি তীর্থ গমনে সাধু সঙ্গ না হয়, অসৎ বিষয়েরই সঙ্গ চলে তবে সে তীর্থ গমন বৃথা হয় জানিবে। ইদানিন্তন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কাশীতে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরকে তারক মন্ত্র দিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সকলে তাহা প্রত্যক্ষ করে কোথায়? যথায় যথায় তীর্থ তথায় তথায় সাধুর বাস ও ধর্ম্মালোচনা। কাজেই সব তীর্থই জপাদির অনুকূল। মহাভারতে বন পর্ব্বের ৮২ অধ্যায়—পুলস্ত্য ভীষ্ম সংবাদে তীর্থ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে দেখিয়া লইবে।

* * * *

তোমার বর্ণাশ্রমাদি প্রশ্ন সম্বন্ধে জানিবা যে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া দুর্লভ নরজন্ম লাভ হয়, নরজন্ম হইলেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না। নরজন্মেও শুভ পথেই বহুবার জন্মিতে হয়। সকলই সিড়ি বদ্ধ। সিড়ির স্তরে স্তরে উঠিতে হয়। ডিঙ্গাইতে গেলেই পতন সম্ভাবনা। নরজন্ম মধ্যে যে সিড়ি তাহা সত্ত্বাদি গুণ ভেদে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হয়। নর জন্ম লাভে চতুর্থ বর্ণে বা স্বকর্ম্ম বা সহজাত কর্ম্ম দ্বারা যে সিদ্ধি (অর্থাৎ ব্যাধের ব্যাধ কর্ম্ম, চণ্ডালের চণ্ডাল কর্ম্ম ইত্যাদি) তাহাতে পর জন্মে বৈশ্যাদি বর্ণে জন্ম হয়, তথায় তথাকার—আশ্রম ধর্ম্ম পালনে ব্রাহ্মণাদি জন্ম হয়। ব্রাহ্মণাদি জন্ম হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে।

তাহাতেও কত কত জন্ম হইতে পারে তাহা নিম্ন লিখিত শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। যথা—মনু :—

ভূতানাম্ প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাম্ বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরা শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃত-বুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্ম বেদিনঃ॥

অথচ বিবেকচূড়ামনৌ :—

জন্তুনাম্ নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা।
তস্মাৎ বৈদিক ধর্ম্ম মার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম॥
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতিঃ।
মুক্তির্নো শত জন্ম কোটী সুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনালভ্যতে॥

অস্যার্থ :—

সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহাদের প্রাণ আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। প্রাণীদিগের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যেও মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান মধ্যে শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে যাহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইয়াছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তিনি শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মানুষ্ঠাতা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জন্তুর মধ্যে নরজন্ম দুর্লভ। নর জন্মে পুরুষ হওয়া দুর্লভ; পুরুষের মধ্যে বিপ্র (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) হওয়া দুর্লভ তাহার চেয়ে বৈদিক ধর্ম্মপথের পথিক দুর্লভ; তাহা হইতে আত্মা সত্য। তদ্ব্যতীত সব অনাত্মা মিথ্যা বিবেচনা দুর্লভ; তদপেক্ষা আত্মার অনুভব বা ব্রহ্ম দর্শন দুর্লভ; ব্রহ্মই আত্মা জানিয়া ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবস্থান—যাহা মুক্তি নামে কথিত হয় তাহা দুর্লভ। শত জন্ম কোটীর পুণ্যফল বিনা ইহা লাভ হয় না। অর্থাৎ মশকাদি কীট পতঙ্গাদি, তৎপর

পক্ষী সরীসৃপাদি, তৎপর মৃগাদি, তৎপর মনুষ্য জন্ম হয়, মনুষ্য জন্মেও বহুবার জন্মিয়া স্বধর্ম্ম সহজাত ধর্ম্ম বা বর্ণধর্ম্ম আচরণ করিলে ক্রমে উপর উপর দুর্ল্লভ জন্ম লাভের পর কৃতকৃত্যতা ব্রহ্মৈক্য দর্শনে পরম পুরুষার্থ লাভ, সা কার্ষা সা পরাগতি। ইহাই সিদ্ধি অর্থ জানিবা। কাজের সফলতাকেই সিদ্ধি বলে। শূদ্রের তৎবর্ণোচিত কাজ, সরল ও শাস্ত্র-সঙ্গত ভাবে অনুষ্ঠান দ্বারা যে সিদ্ধি তাহা বিপ্রতার কারণ হয়। বিপ্রেরা তদ্বৎ নিজ বর্ণোচিত (বৈশ্যের ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণের যৎ যৎ বিধানোক্ত) কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ উন্নত জীবন লাভ এইরূপ যে পর্য্যন্ত না ব্রহ্মবিদ্ হয় সে পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। ইহাই লৌকিক সিদ্ধি জানিবে। অতঃপর জানা আবশ্যক যত বেদ, স্মৃতি শাস্ত্র সব ব্রাহ্মণদিকের জন্য ব্যবস্থিত। আনুসঙ্গিক দুই চারি কথা ক্ষত্রিয়ের জন্য ও ক্বচিৎ কোন কথা অন্য বর্ণের জন্য বলা হইয়াছে। সে ব্রাহ্মণ কে ? এ সম্বন্ধেও শাস্ত্র বিবেচনা করিয়াছেন।

স্থূলদেহ ব্রাহ্মণ নয়, কারণ দেহ যখন চিতায় উত্থিত হয় যেন তাহাতে আঘাত করায় পিতৃহত্যা বা ব্রহ্মহত্যা হইল বলিয়া কেহ বলে না। স্থূল-দেহস্থ সূক্ষ্মদেহ জীব ব্রাহ্মণ নয়, কেন না জন্মে জন্মে অনেক শরীর ধারণ করেন। স্থূলদেহ পাঞ্চভৌতিক চর্ম্ম মাংস রক্ত হাড় নির্ম্মিত,—তাহা সর্ব্বদেহেই সমান ; চৈতন্যত একই চৈতন্য, তাহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশুধর্ম্ম সর্ব্বত্র সমান। জাতি ব্রাহ্মণ নয়, দেখা যায় ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণী গর্ভে ; পরীক্ষিতের শাপদাতা শৃঙ্গী গোগর্ভে ; কৌশিক কুশ হইতে ; শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম ; উর্ব্বশীর গর্ভে বশিষ্ঠ ; দাসী গর্ভে নারদ, কলসে অগস্ত্য ; কৈবর্ত্ত গর্ভে ব্যাস। ইহারা ব্রাহ্মণ সংজ্ঞক ; কাজেই জাতি ব্রাহ্মণ হয় না। জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হন এবং জনকাদি অনেক ক্ষত্রিয় জ্ঞানী ছিলেন। কর্ম্ম ব্রাহ্মণ নয় ; কারণ সকলেই প্রারব্ধ কর্ম্মবশে শরীর প্রাপ্ত হয় ও তৎপর

কিছু না কিছু কর্ম্ম করে। ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ হয় না, কারণ ক্ষত্রিয়াদি বহু প্রকারের দানাদি ধর্ম্ম করে, তবে কে ব্রাহ্মণ ?

উত্তর ঃ—শমাদি সম্পনঃ দম্ভাহংকারাদিহীনঃ
তৃষ্ণা আশা মোহাদি রহিতো নিদ্বর্ন্দ্বো যঃ
কশ্চিদ্ আত্মানম্ অদ্বিতীয়ং ব্রাহ্মস্বরূপং
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মৈবভবতি সঃ ব্রাহ্মণঃ।

লৌকিক ত্যাগে স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম অর্থ এই হয় যে ইন্দ্রিয়াদি ও তৎ বিষয়ক শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও তাহা যাহার ধর্ম্ম, পঞ্চভূত ও তৎউৎপাদিকা মায়া এই সব পর। ইহাদের তৃপ্তির জন্য যে কার্য্য তাহা পরকীয়। আত্মা (স্ব) তার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি তাহা স্ব-ধর্ম্ম। পরধর্ম্ম আত্মাকে আঘাত করে, তাই উহা আত্মঘাতী। আর যাহা আত্মার পুষ্টিসাধন করে, ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে হনন করে, তাহা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় ত্যাগে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তাহাতে স্ব-ধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্ম হয়, তখনই সে আত্মক্রীড় আত্মরতি, আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে। জগৎ তখন আরো উদ্ভাসিত হয় না। কাজেই আত্মা এক ও সৎ এবং তদ্ব্যতীত অন্য যা কিছু সব অসৎ ও মিথ্যা। কারণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬শ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন ঃ—নাসতো বিদ্যতে ভাবো—ন অসতো বিদ্যতে ভাবঃ অর্থাৎ যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব নাই। গীতায় প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ উভয়ই বর্ণিত আছে। অর্জ্জুন গৃহস্থ থাকায় ও তাহার কর্ম্ম শেষ না হওয়ায় লৌকিক কর্ম্মের প্রশংসা গীতায় প্রচুর আছে। লৌকিক কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন। সেই লৌকিক ধর্ম্মকর্ম্ম বর্ণাশ্রম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বরূপে বর্ণিত আছে। যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয় (বিপ্র দেহ না হইলে সম্যক চিত্ত শুদ্ধি হয় না) সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং তাহা

বৈদিক মার্গানুসারে করিতে হইবে (নাস্তিক মতে হয় না)। যে বেদ না মানে সেই নাস্তিক। ঈশ্বর স্বীকারে আস্তিক হইলে মুশা ঈষার সম্প্রদায়ও আস্তিক হয়, বৈদিক মার্গে বর্ণ চতুষ্টয় ও তদনুসারে সহজাত কর্ম্ম বা স্বকর্ম্ম যে বর্ণে জন্ম তদনুযায়ী নির্দ্দেশ করা আছে। * *

আশীর্ব্বাদক

ভোলানন্দ গিরি

---

(১২)

হরিদ্বার

৩১।৫।১৪ ইং

কল্যাণবরেষু,

শুভাশীর্ব্বাদ সমাচার এই,—বৎস তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। দেখ পুত্র, এক মায়ের ৫টী সন্তান থাকিলেও সকলই তাহার সন্তান, সকলের সুখ দুঃখতেই তাহার সুখ দুঃখ হইয়া থাকে। তাহার নিকট বুদ্ধিমানে আর নির্ব্বোধে কিছুমাত্র তারতম্য নাই। সকলকেই বক্ষে নিয়া মাই দিয়াছেন, সকল অবস্থাতেই প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি "মা" ৫টী সন্তানকে খাওয়ায় দিতে সময়ে কাহাকেও লাড্ডু, কচুরি, কাহাকেও মাছের ঝোল, কাহাকেও সুক্তার ঝোল, কাহাকেও সুধু বারলির জল দিয়া এরূপ ভাবে তারতম্য করিয়া আহারিয় দিয়া প্রাণ বাঁচাইল। কেন? না,—যাহার পেটে যেটুকু সহ্য হয় তাহা অবগত হইয়াই তদনুযায়ী বিধান করিতেছেন। সন্তানগণও মাতা যাহা নিজহস্তে দিতেছেন তাহা অমৃত জ্ঞানে তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতেছেন। বারলির জল শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে করিতে সুক্তার ঝোল পাইল, সুক্তার ঝোলে অধিকারী হইয়া মাছের

ঝোল পাইল, মাছের ঝোলে শারীরিক বল যখন বৃদ্ধি পাইল, হজমি শক্তি পুরা হইল, তখন তাহাদের বাঞ্ছিত জিনিষ মিঠাই মণ্ডাও পাইল। বারলির জল হজম করিতে অশক্ত অবস্থায় লাড্ডু কচুরি তাহাকে খাইতে দিলে কি সন্তানের পক্ষে ভাল হইত? এখানে দেখ সন্তান মাতৃ-দত্ত জিনিষ সাদরে গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ সাধন করিতে গিয়া তাহাদের বাঞ্ছিত জিনিষ পাইল।

অতএব বৎস, তোমরাও গুরু হইতে যে জিনিষ পাইয়াছ তাহাতে শ্রদ্ধা রাখিয়া সাধন কর। ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নাম কর। পরম দয়াল তিনি—অবশ্য তাঁহার কৃপা তোমার উপর বর্ষিত হইবে।

অতিরিক্ত ফটোখানা পাইয়াছি, বর্ত্তমানে আমার শরীর ভাল, তোমরা সকলে নারায়ণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী ভোলানন্দ গিরি।

---

(১৩)

ঢাকা গেণ্ডেরিয়ার একজন গুরুভগ্নী কিছুদিন ধরিয়া নানারূপ বিভূতি দেখিতেছিলেন। তিনি রাত্রে প্রায়ই ঠাকুরের দর্শন পাইতেন এবং তাঁহার সহিত নানারূপ কথা বার্ত্তাদি হইত। গুরু ভগ্নীটীর নিবেদিত অন্ন ঠাকুর প্রত্যহ খাইয়া যান এরূপ নানাকথা শুনিয়া বাবু কিশোরীমোহন রায় চৌধুরী ঠাকুরের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে এই গুরু ভগ্নীটির সম্বন্ধে যাহা শুনা যায় তাহা কি সত্য, না তাহা ভেল্কী; আর ঠাকুর সত্যই তাহার নিবেদিত অন্ন খাইয়া থাকেন কিনা? তদুত্তরে কিশোরী বাবুকে ঠাকুর যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এই :—

(১৪)

হরিদ্বার
১১।৪।২৯ ইং

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবে। মণি রত্ন মালা পাঠে ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে লইয়া যায়। এখন পুত্রের উপর সংসারের ভার দিয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ কর। প্রত্যক্ষ আত্মদর্শন কর। স্বপ্নাদিতে দর্শন বিশেষ কিছু নয়। উহা দ্বৈতাভাস যুক্ত। আত্মদর্শনই পরম পুরুষার্থ, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা কর। নাম ও রূপের অতীতে যাও। দর্শন ভোজনাদি নাম রূপাত্মক জানিবে। অত্র শুভ। ইতি—

(১৫)

হরিদ্বার
৭।৫।২৯ ইং

একটী বালিকা (গুরুভগ্নী স্বপ্নে ঠাকুরের অসুখ দেখিয়া ঠাকুর কেমন আছেন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি লিখে, ঠাকুর তাঁহার দেহ রক্ষার অল্প পূর্ব্বে তাঁহাকে যে পত্র লিখেন তাহা এই :— (এই পত্রই ঠাকুরের শেষ পত্র এবং ঐ তারিখ রাত্রেই ঠাকুর দেহরক্ষা করেন)

কল্যাণীয়াসু—

তোমরা আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইলাম। গুরুশক্তি সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার আছে। অনিত্য দেহ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। গুরুগীতা, শিবাপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্র, মণি রত্নমালা মুখস্থ কর। নামে দানে মতি রাখ। অত্র শুভ। নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।

সম্পূর্ণ।

প্রাপ্তিস্থান

স্বামী ভোলানন্দ আশ্রম

পোঃ উয়ারী, টিকাটুলি,

ঢাকা।

শ্রীগৌরানন্দ ব্রহ্মচার

সীতাকুণ্ড ভোলানন্দ সেবাশ্রম,

চট্টগ্রাম।

শ্রীসূর্য্যকুমার দাস, শিক্ষক

অরুণচন্দ্র হাই স্কুল,

নোয়াখালী।

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, হেড্ পণ্ডিত

পোঃ লামচর,

নোয়াখালী।

শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র

মরগেন কোং,

১নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের নিকট

পোঃ বাঞ্ছানগর,

লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী।